অনশনে মহাত্মা

শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

[মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্ত্তিক—১৩৩৯

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

ভারতের সন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। তাঁর জীবনের দানেই ভারত নূতন ইতিহাস গড়িতেছে। এই ইতিহাস আত্ম-বলিদানের প্রভায় শুভ্র, সমুজ্জ্বল—সে পুণ্যময় যুগসৃষ্টি আমাদের যুগপৎ ধ্যান ও প্রত্যক্ষের সামগ্রী।

যে বাণী জীবন, তাহার ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। মহাত্মার মর্ম্মবাণী তাঁর নিজ জীবনে স্বপ্রকাশ। এই লোকোত্তর-চরিত্র যুগপুরুষের সহিত শ্রদ্ধেয় লেখকের দৈবযোগে গভীর পরিচয় ও অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অপার্থিব হৃদয়-সম্বন্ধের অন্যতম ফল—এই অমৃতময় কাহিনী। যারবেদা জেলে ভারতাত্মা মহাত্মা গান্ধী যে দিন অপূর্ব্ব অনশন-যজ্ঞ আরম্ভ করেন, সে মরণপণ তপস্যার বিদ্যুৎ কোথায় না সমানুভূতির সাড়া তুলিয়াছিল! 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় অনিবার্য্য যোগ-সূত্রেরই টানে সেইদিনই এই পুণ্য কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করেন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ মধ্যেই ইহার লেখা সমাপ্ত করিয়া মহাত্মাজীকে তার-যোগে তাহা জ্ঞাপন করেন। জেল হইতে মহাত্মার তারে ও পত্রে আশীষ-লিপি এবং উত্তরবাণী আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। এই ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞের চিরস্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। মহাত্মাও তাঁর পর-পত্রে পুনরায় লিখিয়াছেন—

"...I was sure of the *Sangha's Communion in the fast which was God's doing.*"

—কথাগুলি অনাবিল ও অকুণ্ঠ হৃদয়-সংযোগেরই অভিব্যক্তি! এই অমর স্নেহ ও প্রীতির অবদান আমরা নবজাতিরই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। সঙ্ঘ যদি জাতি-সাধনার অগ্রদূত হয়, মহাত্মার আশীর্ব্বাদ সে জাতিকে ভবিষ্য সাধন-পথে চিরদিন উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিবে।

ভাষ্য নয়, তরুণ ভারতের অর্ঘ্য যুগদেবতার চরণে ঢালিবারই অধিকার আমাদের আছে। "অনশনে মহাত্মায়" গ্রন্থকার বড় দরদ দিয়াই দেখাইয়াছেন—মহাত্মাজীর জীবন ও ভারতের মর্ম্মকথা সত্যই অভিন্ন। এই অভেদ মর্ম্মসঙ্গীতের সামান্য মূর্চ্ছনাও যদি বাঙ্গালীর জীবন-তারে ঝঙ্কার তুলিতে পারে, আমাদের প্রকাশ সার্থক হইবে।

ইতি—

প্রকাশক।

বিষয়-সূচি

মহাত্মা গান্ধী

অনশনে মহাত্মা

প্রশস্তি

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু যে ভারতভূমি-ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্যতাং কর্ম্ম মহীমনন্তে তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥
জানীম নৈতৎ ক বয়ং বিলীনে স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥"

ভারত কর্ম্মক্ষেত্র। শত জন্মের তপস্যায় মানুষ পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করে, শুভাশুভ কোন কর্ম্মফলের ভারতে ভোগ হয় না। ভারত ভোগভূমি নয়, ত্যাগ ও তপস্যার ক্ষেত্র—এই চৈতন্য যখনই ম্লান হয়, নারায়ণ মনুষ্য দেহ-ধারণ করিয়া ভারতের ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন—যুগে যুগে ইহার অন্যথা হয় নাই।

আজ আসমুদ্রহিমাচল মন্দ্রিত করিয়া যে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, ধরিত্রীর পুলক-শিহরণে জাতির প্রাণে যে সাড়া তুলিয়াছে, আবালবৃদ্ধবণিতা একেন্দ্রিয় হইয়া যে ত্যাগ ও তপস্যার মন্ত্রে দীক্ষা লইতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ভারতের সনাতন বাণী আজ মূর্ত্ত, প্রকট, ভাব ভাষা অতিক্রম করিয়া যুগধর্ম্ম-রক্ষায় জীবন্ত বিগ্রহ রূপে এক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী।

সিংহাসনে তুলিয়া লইয়াছে। আমরা সেই পরিচয়-সূত্রের যেটুকু প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাইয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিব।

মহাত্মার তপঃ-শক্তির পরিচয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের মুক্তি সন্নিকট, এই আশা-বাণী প্রেরণ করিয়া প্রধান-মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিল্লীর যুদ্ধ-সভায় মহাত্মা উপস্থিত থাকিয়া ইউরোপের যুদ্ধে ভারতের সাহায্য-দানের সঙ্কল্প করেন। তাঁর কথা এখনও কাণে বাজিতেছে—"With a full sense of my responsibility, I beg to support the resolution." ভারতের ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার প্রাণ ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। মহাত্মার প্রাণপণ উদ্যোগ আয়োজনের কথা পরে বলিব; কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতের মুক্তিবার্ত্তা বৃটেনের কণ্ঠে তেমন স্পষ্ট উদাত্ত কণ্ঠে আর বাহির হইল না, বরং যুদ্ধরত বৃটেন সঙ্কট-যুগে ভারত-রক্ষার অস্থায়ী কঠোর শাসননীতি রাউলাট আইনরূপে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করিলেন। সারা ভারতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল; তখনও খিলাফত সমস্যার মীমাংসা হয় নাই, হিন্দু মুসলমান পরস্পরের স্বার্থে সেদিন হাত-ধরাধরি করিয়া একই লক্ষ্যে ছুটিয়াছে, মহাত্মা ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাদ্রাজে পরামর্শ-রত, অকস্মাৎ স্বপ্ন-দৃষ্ট হইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—ভারতব্যাপী হরতাল। নিখিল ভারত-বর্ষে তাঁর বাণী এমন আগ্রহ সহকারে গৃহীত হইবে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না। আমরাও বিস্মিত হইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম—সাগরগর্জ্জনের ন্যায় 'গান্ধীজির জয়' ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়াছে; নদীবক্ষে একখানি নৌকাও যাত্রী লইয়া

ছুটাছুটি করিতেছে না, হাট বাজার বন্ধ, পথের ধারে বিপণিশ্রেণীর দ্বার রুদ্ধ—এমন সর্ব্বাঙ্গীন হরতাল-দৃশ্য কোনদিন দেখি নাই। মহাত্মার তপঃশক্তির ইহা প্রথম পরিচয়।

তারপর, পঞ্জাবের দুর্ঘটনায় ভারতের চাঞ্চল্য-যুগে মহাত্মার দিল্লীযাত্রা পথে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁর নৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ এক অভিনব ব্যাপার বলিয়া আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। অমৃতসহর কংগ্রেসে তিনি যে বাণী উচ্চারণ করেন, তার প্রত্যেক বর্ণটীর ভিতর দিয়া ভারতের মর্ম্মবীণায় যে করুণ রাগিণী চিরযুগ বাজে, তারই যেন প্রতিধ্বনি শুনা গেল। তারপর বাংলার বিশেষ কংগ্রেসে মহাত্মার আগমন। পঞ্জাব-কেশরী লালাজী সেদিন রাষ্ট্রপতি, পরলোকগত ব্যোমকেশ অভ্যর্থনা সমিতির কর্ণধার। সভায় ভারতের সর্ব্বপ্রকার সমস্যার আলোচনা হইল, মহাত্মার অসহযোগ-নীতি লইয়া গবেষণার অন্ত রহিল না। মহাত্মার রাষ্ট্রসাধনা যে ভারতের ধর্ম্মস্থাপনের ব্রহ্মাস্ত্র, সেদিন কেহ ইহা তলাইয়া বুঝিলেন না। মহাত্মার বুদ্ধি-রাজ্য সমৃদ্ধ রাজনগরীর ন্যায় বিচিত্র শোভাশালী নহে; যুক্তি, তর্কে, বিজ্ঞানের ছকে, তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শ ধরা পড়ে না। পঞ্জাবের ও খিলাফতের প্রতিকারই তাঁর লক্ষ্যে সেদিন প্রতিভাত, স্বাধীনতার আদর্শ মহাত্মার গৌণ লক্ষ্য। ভারতের মুক্তি আত্মার মুক্তি-যজ্ঞের সহজাত ফল; সে মুক্তি ত্যাগে তপস্যায় মিলিবে, আন্দোলনে, বিপ্লবে নয়। ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি জাতিকে এই তপস্যার পথই দেখাইলেন। নেতৃগণ সেদিন তাঁহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, নাগপুরের কংগ্রেসে মহাত্মার দীক্ষা ভারতের রাষ্ট্রসঙ্ঘ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে পথে অগ্রণী হইলেন—বাংলার

অনশনে মহাত্মা

মুকুটমণি সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। মহাত্মার জীবন-গাথায় দেশবন্ধুর স্মৃতি চির-বিজড়িত থাকিবে।

মহাত্মার পথনির্দ্দেশ আমাদের বিচারের বিষয় নহে; জাতির জীবনে যে তপস্যার প্রয়োজন ছিল, কলিকাতার কংগ্রেসে তাঁর বাণীর ভিতর দিয়া আমরা তাহারই সুস্পষ্ট আভাষ পাইয়াছিলাম। ভারতের নেতৃগণের বিচারে মহাত্মার অসহযোগ-মন্ত্র সফল না হওয়ার আশঙ্কা বুদ্ধির সীমায় নিরসিত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। ভবিষ্যৎকে যাঁহারা কল্পলোক হইতে দিব্য ও সুন্দর রূপে নামাইয়া আনেন, তাঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম-প্রেরণা উপর হইতে অবতরণ করে, পার্থিব বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞানের মাপকাটীতে তাহা ধরা যায় না; মহাত্মার বাণী কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিল। সেদিনের এই ক্ষীণকায়, অনতিপ্রসিদ্ধ, নগ্নপদ গুর্জ্জরবাসী অখণ্ড ভারতের মনীষী, প্রতিভাশালী, সহস্র সহস্র চিন্তাবীর কর্ম্মবীরকে যেন ইন্দ্রজালগুণে স্ববশে আনয়ন করিলেন, ভারতের রাষ্ট্র-সভার নবযুগ আরম্ভ হইল। সেদিন দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথ, বিবি বাসন্তী প্রভৃতি গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ প্রভাত-সূর্য্যের উদয়ে অস্ফুট প্রদীপরাশির ন্যায় ম্লান হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। গান্ধীর ক্ষীণকণ্ঠে সেদিন তপোমন্ত্রই বাহির হইয়াছিল, যেন ভবিষ্যযুগের অতিমানুষের দিব্য মূর্ত্তিই আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বরাজের স্বপ্ন ভারতের তপস্যায় এক বৎসরে সফল হওয়ার কথায় সকলে বিস্মিত হইল বটে; কিন্তু তাঁর নয়নের দীপ্তিতে যে বিশ্বাসের প্রদীপ্ত অনল ছিটকাইয়া বাহির হইতেছিল, তাহাতে সকলেই অভিভূত হইলেন—গান্ধীর পরিচয় বাঙ্গালী ভাল করিয়াই পাইল।

আমরা বুঝিলাম—ভারত সত্তা আজ বহু বরেণ্য ব্যক্তির মধ্য

হইতে এই সৌভাগ্যবান্ পুরুষের ললাটে জয়চিহ্ন আঁকিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেশমাতৃকার খণ্ড ইষ্টমূর্ত্তির পূজায় বাঙ্গালী উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তার কণ্ঠে সপ্তকোটী কণ্ঠের জয়-নিনাদ উঠিয়াছিল; আজ ত্রিংশ কোটী কণ্ঠের কলকল নিনাদে পৃথিবী মুখরিত হইল। আর ভারতের আন্দোলন রাষ্ট্র নহে, ধর্ম্ম। আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম, তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে ধর্ম্মে পরিণত করার দুর্জ্জয় তপস্যা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিধিনির্ব্বন্ধে পঞ্চনদ বিপর্য্যস্ত, খিলাফৎ ক্রুদ্ধ অজগরের ন্যায় রোষোন্মত্ত, বৃটেনের চির ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রভাগ্য দুরপনেয় মসীচিহ্নে কলঙ্কিত। সবই উপলক্ষ্য, বিধাতার অমোঘ লক্ষ্য ভারতের অধ্যাত্ম জাগরণ। রাষ্ট্র-সাধনাকে দিব্যমন্ত্রে সমুজ্জ্বল তপঃশুদ্ধ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বিধাতার সুমহৎ ইচ্ছাই সুসিদ্ধ করিবেন। মরা গঙ্গায় সেদিন জোয়ার ডাকিয়া আনার এই ভারতের ভগীরথের চরণে ভূয়সী প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।

তারপর একে একে উদার সরলপ্রাণ ভারতের উদীয়মান শক্তিধর পুরুষগণ মহাত্মার পতাকাতলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় সমাগত হইতে লাগিলেন। বুদ্ধিজীবী, বিলাসমগ্ন, খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিদ্, সাহিত্যিক, কবি, ধর্ম্মধ্বজী মহাত্মার অল্পবুদ্ধির বিশ্লেষণ আরম্ভ করিলেন; মহাত্মার কণ্ঠে তদুত্তরে অপূর্ব্ব ঋক্ উচ্চারিত হইল। এই :কথাগুলি ভারতপ্রাণ হিন্দু জাতির মর্ম্মস্পর্শী :—

"No one may feel anxious about my belief. I wish people will cease to think of what I believe and begin to believe something themselves. If I could infect India with the intensity of my belief, she

can gain Swaraj to-day, for the will of a nation composed of three hundred millions of men and women acting in union cannot be withstood by any power on earth."

অর্থাৎ আমার বিশ্বাস লইয়া কাহারও ভাবিতে বসিবার প্রয়োজন নাই। আমি ইচ্ছা করি, আমার বিশ্বাস লইয়া মানুষ যেন চিন্তা না করে; বরং তাহারা কিছু নিজেরা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করুক। যদি আমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতাম, আজই সে স্বরাজ লাভ করিত। ত্রিশকোটী নরনারী লইয়া যে জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা যদি একযোগে কার্য্য করে, জগতে এমন শক্তি নাই, তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

এই বিশ্বাসের হোমকুণ্ডে মহাপ্রাণ প্রধান প্রধান দেশ-নেতৃগণ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, মহাত্মার প্রভাব অস্বীকার করার উপায় রহিল না। আনুগত্যের সাধনায় মানুষ সাযুজ্যের অধিকারী হয়; মহাত্মার তপোবীর্য্য-প্রাপ্তির এই রাজপথ বিস্তারিত হইল—কিন্তু বুদ্ধির জগতে এ রহস্য দুর্জ্ঞেয়, এ পথ সেখানে অস্বীকৃত। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমণ্ডলীর শিক্ষার প্রভাবে এ জাতির দৃষ্টি আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন—"The idea of merging our personalities in another being is as horrible as it is unsound" (Col. Jacob)। "আমাদের ব্যক্তিত্ব অন্য ব্যক্তিতে লয় করিয়া দেওয়ার আদর্শ যেমনই ভীষণ তেমনই যুক্তিহীন;" এই বুদ্ধির প্রভাব ভারতের মনীষা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ প্রতিভাশালী নেতৃবৃন্দকে বার বার এই ব্যক্তিত্বরক্ষার দায়ে মাথা তুলিতে দেখিয়াছি। ভারতের

পরিচয়

ধর্ম্ম বিজ্ঞান মোক্ষের যে পথ-নির্দ্দেশ দিয়াছে, তাহাতে লয় ছাড়া কথা নাই। মহাত্মা জাতির নবজন্মের দাবী ঘোষণা করিয়াছেন; এ দাবী এমন উদাত্ত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে, যাহাতে সংশয়, যুক্তি, বিচার ভারতের ভাবশুদ্ধ হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না; কিন্তু ঝড়ের মত এই কঠোর সাধনা একেবারেই মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিপ্লব বাধিয়া গেল। মহাত্মার পরিচয় ভাল করিয়া পাইলাম; কিন্তু দূর হইতে তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বুঝিবার গোল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা দুর্ণিবার হইল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা। আমেদাবাদের কংগ্রেসে দেশবন্ধু সভাপতি হইবেন; কংগ্রেস তখন মহাত্মার করতলগত; বিদেশী প্রভাব হইতে জাতীয় সভাকে ভারতীয় ভাবে গড়িয়া তোলায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।

ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল মহামতি কয়েকজন ইংরাজের চেষ্টায় ভারতে এই বিপুল রাষ্ট্র-সভার প্রতিষ্ঠা হয়; ইহা চিরদিন বৃটেনের প্রতি সরল বিশ্বাসে মুক্তি-প্রার্থনায় প্রতি বৎসর মুখরিত হইত। জাপানের অভ্যুদয়ে ভারত-রাষ্ট্রক্ষেত্রে নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিল; তারপর লর্ড কর্জ্জনের আচরণে বাঙ্গালী বিক্ষুব্ধ হইয়া কংগ্রেসকে অগ্নিক্ষেত্র করিয়া তুলিল—সুরাটের দক্ষযজ্ঞ ইহার পরিণাম। অতঃপর ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া দিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় গোখ্‌লে মহোদয় ইহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিলেন। পুরাতন কংগ্রেসের বেদী ভাঙ্গিয়া চুর হইয়াছিল, মহাত্মার প্রচেষ্টায় আবার ইহা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। আমেদাবাদে কংগ্রেসের নবশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

অনশনে মহাত্মা

মহাত্মা সেদিন ভারতের একচ্ছত্র নেতা, 'ডিক্টেটর'রূপে কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া অসির ন্যায় ক্ষুরধার শাণিত, সীসার ন্যায় ভারী নিরেট বস্তুতন্ত্র, স্পষ্ট স্পষ্ট এক একটী বাণী বিশ হাজার মানুষের কাণে ঢালিয়া দিতেছিলেন; চক্ষে জ্বলিয়া উঠিতেছিল ধক্ ধক্ করিয়া বিদ্যুৎশিখা, ললাটে প্রলয়ের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল মৃত্যুঞ্জয়ের ভীম ভৈরব নিনাদ—সে যেন মহাকালের গর্জ্জনধ্বনি, কুরুক্ষেত্রের রণহুঙ্কার!

সেদিন কাণে যে বাণী প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা মর্ম্মগত হয় নাই; কথায় কাণ ছিল না, স্বরাজের ঘোষণাবাণী শুনিবার আকুলতা ছিল না, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিজ্ঞাপত্রে সঙ্কল্প-মন্ত্রোচ্চারণের গুরু-গুরু বজ্রধ্বনি কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, চিত্রার্পিতের ন্যায় ভারতের এই তপোমূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিলাম। অহিংস-মন্ত্রের দেবতা, করুণা দিয়া তো গড়িয়া উঠে নাই, এ যে বজ্রমূর্ত্তি! জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা কোথা, বিদ্যুতের উত্তাপে সব যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল! প্রলয়-তুফান, কাল-বৈশাখীর তুমুল ঝঞ্ঝাবাত পুঞ্জে পুঞ্জে জড় হইয়া তাঁহার মাথার উপর ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজন করিয়াছিল, আর সেই বিশীর্ণ অর্দ্ধোলঙ্গ তেজোদীপ্ত তনুখানি ঘিরিয়া যুগ যুগান্তের ঘনীভূত ভারতের তপস্তেজঃ অপূর্ব্ব লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছিল! বুদ্ধ, শঙ্কর, নিমাইয়ের সাধনা, দধীচি, কুরেশ, গোবিন্দের আত্মাহুতির জ্যোতির্ম্ময় জ্বালা তাঁর মুখমণ্ডল ঘিরিয়া স্বর্গীয় আভা বিকাশ করিয়াছিল—দূর হইতেই রুদ্রকে নমস্কার করিলাম।

সবরমতীর পরপারে তাঁর আশ্রমকুঞ্জে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটিল। ওষ্ঠপুটে মৃদুহাসি—মধুর, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও আকর্ষণময়, কিন্তু সে হাসি

রুদ্রের হাসি, মৌলিক বিশেষত্বমণ্ডিত। পরিচয় পাইয়া বলিলেন—
"I welcome you, Standard-bearer"—প্রবর্ত্তককে অভিবাদন
করি। কথা কিছু ছিল না, রুদ্রের সঙ্গে পরিচয়টুকু লইয়াই সে যাত্রা
সমাপ্ত হইয়াছিল, ঘনিষ্টতা হয় নাই।

অসহযোগের দ্বিতীয় যুগের কথা। রাজকর্ত্তৃপক্ষ কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন
করিয়া আন্দোলন বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেশবন্ধু কারাগৃহ
হইতে সদ্যমুক্ত হইয়া সহকর্ম্মীদের বন্দীদশায় বিভ্রান্ত, উন্মাদ হইয়া
মহাত্মাকে বাংলায় ডাকিয়া আনিলেন। কলিকাতার বুকে অকস্মাৎ
মহাত্মাকে উপস্থিত করিলে কি ভীমকাণ্ড ঘটিবে, কে জানে! এই
আশঙ্কায় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে তাঁহাকে নামাইয়া, ভাগীরথী বহিয়া মহাত্মাকে
দেশবন্ধু কলিকাতায় আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহাত্মার সহিত পত্র-ব্যবহার মাত্র হইয়াছে। ফরাসী পুলিশ সংবাদ
দিল—মহাত্মা প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।
আশ্রমে চাঞ্চল্যের সীমা রহিল না; নারী পুরুষ ছুটিল, পথের লোকসঙ্গ
লইল— সে এক অপূর্ব্ব উৎসাহ! কিন্তু কথাটা সত্য নহে;
ফরাসী-রাজ্যের সীমায় তিনি ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিয়া, ইহার সৌন্দর্য্য
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মহাত্মার এই অবস্থিতির অর্থ আমাদের
সহিত সাক্ষাৎ করা ছাড়া আর কিছু নহে, ইহা অনুমান করিয়া
ফরাসী পুলিশের এই কীর্ত্তি! আমরা অর্দ্ধপথে খবর পাইলাম, তিনি
প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই উদ্বেগ, উত্তেজনা নিরর্থক হয় নাই; পরে
তিনি জানাইয়াছেন—চন্দননগরের নিকটে তাঁহার 'লঞ্চ' উপস্থিত
হইলে সঙ্ঘের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া দেশবন্ধুর সহিত আলোচনা
করিয়াছেন এবং নদীতটের অতি সন্নিকটে আমাদের আশ্রম, ইহা যদি

জানিতেন তাহা হইলে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর অবতরণে বাধা ছিল না। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আকুলতা বৃদ্ধি পাইল।

বাংলায় সেদিন গান্ধী-যুগ উল্টাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'No-changer', 'pro-changer' দলভেদে "স্বরাজ-পার্টি" গড়িয়া উঠিয়াছে; মহাত্মাকে দূরে সরাইয়া কংগ্রেস স্বরাজসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। বাংলার দুর্দ্দিন বর্ণনার নহে। মহাত্মা "স্বরাজ-পার্টিকে" নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলেন, অভয়মন্ত্রে সারা ভারতে মহাত্মার জয়ধ্বনি উঠিল। সারা বাঙ্গালী জাতির সহিত তাঁহাকে আমরাও নীরবে অভিনন্দিত করিলাম। পরিচয়ের স্তর আরও ঘনীভূত হইল।

বাংলার দুর্দ্দিনে মহাত্মাকে বিপুল আশ্রয়রূপে দেখিয়া মনে হইল, তিনি কেবল রুদ্র নহেন, কেবল ধ্বংসের দেবতা নহেন, সৃজনের প্রস্ফুট কমল তাঁর চারু করে শোভা পাইতেছে; পালনের রূপ, করুণার বেশে, বিষ্ণুর বিগ্রহ; সে পরিচয় ভাল করিয়া পাইলাম সঙ্ঘের বিপদের দিনে, এই পরিচয় হৃদয়ে দৃঢ় আঁকড় কাটিয়া দিল।

বাঙ্গালী জাতির জাগরণের যুগ হইতে যে তরুণ শনৈঃ শনৈঃ মাথা তুলিতে চাহিয়াছে, তাহার সবখানি দৃষ্টি একদিনে সুস্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে কখনও জটিল তির্য্যক পথে, কখনও বা সরল ঋজু পথ ধরিয়া চলিতে হইয়াছে; নব নব অভিজ্ঞতার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদের ভাগ্যে এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে; মহাত্মা নিজেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন "It is surprising how troubles after troubles overcome you!" সুগভীর মাতৃহৃদয়ের দরদ দিয়াই তিনি সব বস্তু দেখিয়া থাকেন; এই দরদেই বাংলার মাথায় বজ্রপাত হইলে দেশবন্ধুর

মৃতশরীর বুক দিয়া তিনি বহন করিয়াছিলেন; চিত্তরঞ্জনের প্রজ্জ্বলিত চিতার দিকে তাঁর সেই শোককাতর করুণদৃষ্টিটুকু ভুলিবার নয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও বৃটিশের যুক্ত-বজ্র আমাদের মাথায় পড়ে। আমরা বিভ্রান্ত, দিশেহারা; মহাত্মার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমাদের অব্যর্থ লক্ষ্য বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছিল। তিনি বহু বাধা উপেক্ষা করিয়া এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার দিনে পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দুঃসময়ের বন্ধুরূপে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন, অভয় দিলেন, সান্ত্বনা দিলেন; তাঁর আশীর্ব্বাদের ঝরণাধারায় আমাদের অবসন্ন চিত্ত নবউৎসাহে প্রবুদ্ধ হইল, সে প্রীতিমধুর বন্ধন অন্তরে অন্তরে যে যোগ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বুঝি ভুলা যায় না। তাঁর নিজের কথায় এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়—"We stand on our own faith, which will make us whole."

এই প্রথম আগমন তাঁর অল্পক্ষণের জন্য; কিন্তু তাঁর তপোমূর্ত্তিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়ার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। মহাত্মা কিশোরমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন নহেন, তিনি বৃদ্ধ, শীর্ণকায়; মুখমণ্ডল অনতিবৃহৎ; কিন্তু বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে প্রসন্ন-উজ্জ্বলদৃষ্টি, পরিধানে কটিবাস। মিঃ পিয়ার্সন সত্যই বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী যেন 'St., Francis of Assisi." ভারতের সত্য শিক্ষা ও সাধনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে এই ঘোর অবিশ্বাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইতে যেন আবির্ভূত হইয়াছেন!

মহাত্মা ভিক্ষুক, পরম ভিক্ষুক। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি, মোক্ষপ্রার্থী; কিন্তু দেশ ও জাতির মুক্তিব্রত সিদ্ধ না হইলে বুঝি তাঁর সম্মুখে মোক্ষের দুয়ার মুক্ত হইলেও ফিরিবেন—দুঃখের পথে, ব্যথার

পথে, চিরদিন ভিক্ষুকের বেশেই ভ্রমণ করিবেন। তাঁর নিজের বাণীই এইখানে উদ্ধৃত করি। মোক্ষপ্রার্থী পুনর্জ্জন্মের দায় হইতে মুক্তি লইতে চাহে; মহাত্মা এই সনাতন ধর্ম্মপথই আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু যতদিন জীবন, ততদিন তিনি দুঃস্থ, কাঙ্গাল, অস্পৃশ্য-জাতির জীবন লইয়াই বাঁচিতে চাহেন। "...I may share their sorrows, suffering and the affronts levelled at them in order that I may endeavour to free them from their miserable condition."

ইহার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কথা। যে মানুষকে কাছে না পাওয়া যায়, তার পরিচয় নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় না। এবার মহাত্মাকে আমাদের মধ্যে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিকালে নিদারুণ শীতে মহাত্মার আগমন; নগরপথে দীপালীশোভায় তাঁর অভ্যর্থনায় সে রজনী উৎসবময় হইয়াছিল।

সে কথা ভুলিবার নয়। মহাত্মার পরিচয় বাঙ্গালী যত অধিক পাইবে, ততই বুঝিবে—এ প্রাণ ভারতের অমর বীর্য্যময়, ভারতের ধাতু দিয়া গড়া, ভারতীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতেই ইহার আবির্ভাব।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় তাঁর একবিংশতি দিন উপবাস তাঁর এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার নিবিড় সঙ্কল্পের পরিচয়; ইহা রাজনীতিক চালাকী নয়, ইসলাম সম্প্রদায়কে সঙ্গে রাখিয়া স্বকার্য্য-সিদ্ধির উপায় নয়, তিনি মুক্তকণ্ঠে আমাদের বলিয়াছেন—"I have an implicit faith that Hindus and Mussalmans will one day come together and that faith is derived from

my faith in Hinduism and ultimately in Hindu nature."

"হিন্দুত্বের উপর এবং হিন্দু-প্রকৃতির উপর পরম আস্থার ফলে আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় হইয়াছে, যে হিন্দু-মুসলমান একদিন একত্র হইবেই।" মহাত্মা আজ হিন্দুর মধ্যে ভেদ-সৃজনের সম্ভাবনা দেখিয়া প্রতিকার-কামনায় মরণপণ করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান একত্র করার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন ইহাপেক্ষা হয় তো অধিক ব্যগ্র হইবেন; তবে তাঁর এই সকল কর্ম্ম ও ভাবপ্রেরণা বুদ্ধির হিসাবে বাহির হয় না, অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশে ঘটে—আমরা তাই নির্ভয়। মহাত্মার পরিচয় বিশদ করিয়াই পাইয়াছি।

মহাত্মার অসহযোগ-অস্ত্র দুর্ব্বলের অস্ত্র নয়, বীরের ব্রহ্মাস্ত্র। আত্মিক শক্তি-বলে তিনি পৃথিবীর উপর হইতে যাহা অসৎ, যাহা মোহ, যাহা কুৎসিৎ তাহা দূর করিতে চাহেন। সে দূর করার উপায়—আত্মদান। যে ভীরু, যে স্বার্থপর, তার আত্মবলি কখনও সম্ভব হয় না।

চৌরিচোরার ঘটনায় তিনি মুখ ফিরাইলেন। সংঘর্ষ-সৃষ্টির উত্তেজনা লইয়া তাঁর কর্ম্মপ্রেরণা জাগে নাই, তিনি আত্মার নির্ম্মল ভাস্বর মূর্ত্তিই লক্ষ্যে রাখিয়া চলিয়াছেন; তাহাতে বিঘ্ন যেখানে, সেখানে তিনি স্তব্ধ অটলপদে দাঁড়াইয়াছেন—তাঁর অমোঘ বিশ্বাস, অভ্রান্ত লক্ষ্য, অসীম ধৈর্য্য।

এই সদ্‌গুণ ভারতীয় ভাবসিদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। একজন ফরাসী লেখক সত্যই বলিয়াছেন—প্রাচ্য-চরিত্রের ইহা যথার্থ বিশ্লেষণ—"They will wait centuries, if necessary, for the

fulfilment of their ideal, and when it rises triumphant after such a long slumber it does not seem to have aged or lost any of its vitality." অর্থাৎ শত শত শতাব্দী ইহারা নিজেদের আদর্শ পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করে। এইরূপ দীর্ঘ নিপীড়িত জীবন যখন জাগ্রত হয়, তাহার প্রাচীন স্থবির মূর্ত্তি থাকে না, শক্তির বিদ্যুৎ তার সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফুরিত হয়।

হিন্দু আজ হাজার বৎসর অবনত শিরে অপেক্ষমান; মহাত্মারও প্রতি পদক্ষেপ প্রতিবৎসরে সাফল্যলাভের সঙ্কল্পে অগ্রসর বটে; কিন্তু অসংখ্য যুগ সে সাফল্যের প্রতীক্ষায় নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি ধৈর্য্যধারণে যে সক্ষম, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রোঁমা রোঁলা সত্যই বলিয়াছেন—"He does not force time, and if time makes haste slowly, he regulates his gait by its march."

তিনি কালজয়ী মহাপুরুষ।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে দ্বিষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ যষ্টি হস্তে পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিতে ছুটিলেন—কে বলিবে, লক্ষ্য তাঁর বাস্তব বাধার সহিত সংঘর্ষ-সৃষ্টি! তিনি ভাগবত পথের যাত্রী। এ পৃথিবী ভগবানকে হারাইয়া অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছে, তাঁর গতি তাই প্রতিপদে রুদ্ধ, কিন্তু হিমাদ্রীর প্রস্তরগাত্র বিদীর্ণ করিয়া যে জাহ্নবীধারা সাগরসঙ্গমে ছুটিতে চাহিয়াছে, সে প্রবাহ অবরুদ্ধ হইবে কোন্ বাধায়? তাঁর কারামুক্তির পর লণ্ডনযাত্রার উৎসাহ অভিনব।

পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের পর আবার বজ্রমন্ত্রে ভারতের সনাতন ঋক্ ঝঙ্কার তুলিল, রাষ্ট্রক্ষেত্রে এমন অপ্রাসঙ্গিক বাণী এই প্রথম উচ্চারিত হইল। মহাত্মারাষ্ট্রক্ষেত্রে ধর্ম্মকেই প্রচার করিতে

চাহিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি না গড়িয়া উঠিলে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা হইবে কেন!

তাঁর উপাসনার মন্ত্র বিলাতের সেণ্টজেম্‌স্ প্রাসাদেও কুণ্ঠিত, নীরব হয় নাই, যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিলাতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছে। বুদ্ধিমান্ প্রশ্ন তুলিলেন—সারা জীবনই উপাসনা, ইহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? মহাত্মার সহজ উত্তর—যিনি ভাগবত পুরুষ, তাঁহার উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তবুও জগতের ভাগবত-চেতনা-হারার দলকে ঈশ্বরের পথে তুলিয়া লইবার জন্য যথানিয়মে প্রত্যেকের উপাসনা করার আবশ্যকতা আছে। গীতার মন্ত্রই পুনরুচ্চারিত হইল --

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"

মহাত্মা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিন্দু-ভারতকে জাগ্রত করার সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তিনি বন্দী হইলেন। উত্তেজনার শেষে ভারতে অবসাদের মেঘে আকাশ ঘনাইয়া আসিতেছিল, পথহারা ভারতের হিন্দুজাতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মবিশ্বাসহীন, অন্ধকারে হাতড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া নিজেদের দাবী জ্ঞাপন করিতেছিল; অকস্মাৎ যারবেদার কারাগৃহ হইতে রুদ্র কণ্ঠে বজ্রগর্জ্জন শুনা গেল—'ঈশ্বরের সঙ্কেত, অখণ্ড হিন্দুজাতি যদি ভারতে আজ দাঁড়াইতে অসমর্থ হয়, প্রাণ বলি দিয়া এই অক্ষমতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

দ্বেষ-বিদ্বেষ-স্বার্থশূন্য মহাত্মার মৃত্যুপণ অন্তর্য্যামীর ডাকে বজ্রসঙ্কল্পপূর্ণ, এখানে জীবন মৃত্যু তুল্য কথা। তন্দ্রাতুর ভারতের

অনশনে মহাত্মা

হিন্দুজাতির প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎ-শিহরণ জীবনের লক্ষণ। যাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে আজ জাতি নব-জীবনের পথে তাঁহার পরিচয় ভাষায় দিবার নহে ; তাই আজ মহাত্মার বন্দনা-সঙ্গীতে নিখিল বিশ্ব কলরবময়। আমরা তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের নিগূঢ় রহস্যের কথা যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

যুগ-প্রয়োজন

ভারত-সভ্যতার কালের হিসাব যখন করা হয়, বিধাতা অলক্ষ্যে বিদ্রূপ-হাস্য করেন। প্রত্যক্ষ নজির না পাইলে বস্তুর প্রতি বিশ্বাস না করার মাথা এদেশে খুব গৌরবের কথা নহে, ইহা একান্ত জড় সীমাবদ্ধ মস্তিষ্কবৃত্তি। এক্ষণে আমরা অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্ম মস্তিষ্কবৃত্তি হারাইয়াছি; এই ক্ষতি রাজ্যহারা হওয়ার অপেক্ষা আমরা অধিক বলিয়া মনে করি।

শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের যাহা ছিল, এখন তাহা নাই; শতাব্দী পরে আমাদের বলিয়া এখনও যাহা আছে, তাহাও হয়তো থাকিবে না—ভারতপ্রাণ মনীষীদের দুর্ভাবনা এইজন্যই অধিক হইয়াছে। আজ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতি বিধাতার বজ্রাঘাতে বুঝিতেছে—ধর্ম্ম শুধু বেদ নয়, অধ্যয়ন নয়, সমাজ নয়; জাতিবর্ণ নয়, ধর্ম্ম জীবনের সবখানি লইয়া মূর্ত্ত, তার একাঙ্গ ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বাঙ্গই পঙ্গু, ব্যর্থ হয়; তাই রাষ্ট্রহারা হিন্দু রাষ্ট্রশক্তিলাভে উদ্যত হইয়াছে এবং তাহার জন্য ভারতীয় ভাবই আশ্রয় করিয়াছে। হিন্দুর সবখানি দরদ, মমতা গিয়া মহাত্মায় আশ্রয় লইয়াছে, একথা আজ কেহ আর অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু রাষ্ট্র কেন? ভারত ভোগবাদী নয়, রাষ্ট্রে আমাদের প্রয়োজন কি? ভারত কর্ম্মবাদী, কর্ম্ম যজ্ঞ-স্বরূপ, ভারতের ইহা সনাতন ধর্ম্ম। বহু সুকৃতিবশে ভারত-ভূমিতে সকল নরনারী জন্মগ্রহণ করে; তাহারা জীবন ভাগবত আরাধনায় সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়,

জীবজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি না থাকিলে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের যথার্থ গৌরব রক্ষা করা যাইবে না; ক্ষত্রিয় তাই জাতি ভারতের রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয় হইয়াছিল। ভারতের ধর্ম্ম মোক্ষ, ভোগবাদ নয়; কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্য, সমাজ, বেদাচার মুমুক্ষুর ধর্ম্মাঙ্গরূপেই পরিগণিত হইয়াছিল, রাষ্ট্রকেও ইহার সহিত একাঙ্গ করিয়া ধরা হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্ব কর্ম্মই যজ্ঞস্বরূপ, জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল কর্ম্ম, অকর্ম্ম, সবই ইহার জন্য তুল্য প্রয়োজন; সর্ব্বকর্ম্ম ধর্ম্ম স্বরূপ—এই হেতু কর্ম্মভেদে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ভারতের অখণ্ড প্রাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আজিকার মত এমন করিয়া বিভক্ত করে নাই; রাষ্ট্রশক্তি না থাকায় ভারতের লক্ষ্য ও আদর্শ ম্লান ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের অধিবাসী মাত্রই মুমুক্ষু; মুক্তিই তাহাদের লক্ষ্য, একটা জাতির ইহা আদর্শ। এই সুমহান্ লক্ষ্য ও আদর্শের পথে প্রচুর প্রাণবন্ত জাতিই অগ্রসর হইতে পারে। জীবনের জন্য তাই জগতের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সংস্থত করা মোহ নয়; বস্তুর সামঞ্জস্য, সংরক্ষণ, আদর্শকে অব্যাহত ভাবে রক্ষা করার ইহা সুনীতি। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় জীবপ্রবাহ অনন্তগতি লইয়া ছুটিয়াছে; যে প্রাণবিন্দু আত্মস্বরূপে লীন হয়, তাহা অখণ্ড প্রাণ-প্রবাহের সবখানি নয়, তাঁর নিত্যত্বের সবখানি নিদর্শন পিছনে পড়িয়া থাকে। ভূমার চৈতন্যে এ জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ব্যষ্টি ও সমষ্টির রহস্য বুঝিয়াছিল, ব্যষ্টিত্বের পরিণতির সহিত সমষ্টির পরণিতি এক করিয়া ধরে নাই; ব্যক্তির লক্ষ্য লয় ও মোক্ষ হইলেও, জাতিকে তাহারা চিরযুগ সনাতন জাতিরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। ভারতের সে অমোঘ ইচ্ছা বাহিরের দৃষ্টিতে স্তিমিত, লুপ্ত মনে হইলেও, ফল্গুধারার ন্যায় ইহার গতি

অব্যাহত ভাবে এখনও চলিয়াছে—বর্ত্তমান যুগ তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভারতে জীবের মুক্তি মোক্ষের জন্য যে পরিপূর্ণ জ্ঞানমূর্ত্তি জাতি ও রাজ্য গঠন করার প্রয়াস, তাহার উত্থান-পতনের ইতিহাস আছে; সে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আছে; কিন্তু অর্ব্বাচীন রীতি অনুসরণ করিয়া ইহার সিদ্ধান্ত হয় না, অথচ তাহা না করিলেও চলে না; কাজেই ভারতের প্রাচীনত্ব-নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা অতিশয় কৌতুকপ্রদ। মানুষের বিচার-মাহাত্ম্যে চমৎকৃত হইতে হয়, সত্য কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে; ভারতের ইতিহাস ইহাতে অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া উঠে। সৃষ্টির মূলে যে উদ্দেশ্য, যে ভাগবত ইচ্ছা, তাহার সহিত চৈতন্যযুক্ত হইয়া ভারতের ঋষি ত্রিকালদর্শী হইয়াছিলেন। অতীতের ইতিহাস এবং ভবিষ্য চিত্র দুইই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নজিরের উপর তাহার প্রমাণ নির্ভর করিলে, আমাদের তাহার জন্য গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন; স্বল্প চেষ্টা ও বুদ্ধি বশতঃ উহার যতটুকু তলস্পর্শ হয়, তাহাই শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ক্ষণভঙ্গুর জড়চেতনা ভারতের অস্তিত্ব-জ্ঞানের বেদী নয়। ভারত আত্মবিৎ, ইহা অজ, শাশত, সনাতন—পৃথিবীর সৃষ্টিকাল তাই এই আত্মজ্ঞানীর চক্ষে কালের সীমায় আবদ্ধ নয়, পৃথিবীকে এজাতি অতিশয় তরুণ বলিয়া স্বীকার করেন। ত্রিংশকল্পাব্দের ইহা প্রথম কল্প, ইহার পরিমাণ চারি শত বত্রিশ কোটী বৎসর; চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ইহার মধ্যে আছে; একাত্তর দিব্য যুগ এক এক মনুর অধিকার কাল; সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এক একটী দিব্যযুগ, মাত্র ছয়টী মন্বন্তর পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; ইহা সপ্তম মনুর যুগ। কত কোটী বৎসরের ইতিহাস ভারত

বুকে করিয়া বহিয়াছে, তাহা ইহা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। কল্পনা, পৌরাণিক উপকথা বলিয়া ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হাসিয়া উড়ায় বলিয়া ভারতের আত্মবিশ্বাস কোনদিন ক্ষুণ্ণ হইবে না।

ভারত এই যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি বহন করিয়া ভারতের সভ্যতা ও আদর্শ রক্ষা করিতেছে, প্রলয়ের আবর্ত্তনেও তাহার সত্য ধ্বংস হয় নাই। বুদ্ধির জগতে ইহা স্বীকৃত নয়, ভারত কিন্তু ইহা স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পরিদর্শন করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির স্মৃতি ভারতবাসীর অন্তরে জন্ম-সংস্কারবশতঃই হউক অথবা বিশ্বাস-বস্তুর অপার্থিব মহিমা-বশেই হউক, যুগের স্বপ্নরূপে সে চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে। এই বিশ্বাসের আগুন চক্ষের দীপ্তি; আকাশের কোল ছানিয়া তাই সে থরে থরে ভারতের এক বিশাল সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনা করিয়াছে এবং এই অন্তশ্চক্ষুর বিকাশে অতীতের কল্পচিত্র ভারতের ঋষিকল্প ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি বেদবিদ্ ঋষি ব্রাহ্মণ সংহিতায় ব্রাহ্মণে, পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস বিশুদ্ধ চিত্তের অব্যর্থ অনলবর্ষী নয়নের দীপ্তি, বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রের নিরেট সীসার অক্ষরে কাগজের পৃষ্ঠে খোদাই করা হরপের উপর ন্যস্ত হয় না; ইহার অন্যথা যে ক্ষেত্রে সেখানে এই অন্তবিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বদেশ ও স্বজাতির উপর আমাদের অনাস্থার গোড়ার কথা এইখানে।

দেশ, জাতি, জাতির আদর্শ, এই লইয়া ভারতে তুমুল আন্দোলন চিরযুগ ঘটিয়াছে; তাহার জীবন্ত ইতিকথা আমরা একটু চেষ্টা করিলেই আয়ত্তে আনিতে পারি। এখন সে কথা থাক্। ভারতের ইতিহাস কুরুক্ষেত্রের পর হইতে অতি আয়াসে আরম্ভ করার সুবিধা আমাদের হইয়াছে—এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর পুরা সম্মতি ইহাতে

পাওয়া যায় নাই; কিন্তু আমরা বলিব, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বেই অমিশ্র ভারতেতিহাস পাওয়া যাইবে; এই অন্ধকারে গর্ত্ত হইতে ভারতের স্বরূপ বাহির করিতে হইবে। এই পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস অবিশুদ্ধ, নিছক ভারতের ইতিহাস নয়; একটা মিশ্র আদর্শ ও জাতির সমন্বয়সাধনের সংগ্রাম-ব্যাপারের ইহা ইতিহাস বলিতে পারা যায়। ইহা কলির ইতিহাস, ভারতের স্বর্ণ- যুগের ছায়া মাত্র ইহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ভারতের আদর্শ ও সভ্যতা এই পাঁচ হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়া বুঝিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রে সে সভ্যতা ও আদর্শের চরম আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের তাহা পাঞ্চজন্যনিনাদ।

বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করার প্রচেষ্টা অনর্থক; কাল-নির্ণয়ের উপাদান এদেশে মিলে না, তবুও উপাদানের আশ্রয়ে পিছাইতে পিছাইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন, ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ছয় হাজার বৎসর হইবে। বৌদ্ধযুগের জ্ঞানালোকে যেমন সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, বৈদিক ভারতের আদর্শ ও সভ্যতার সংস্পর্শে তেমনই ভূমণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি খৃষ্টীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতবাদ বৈদিক ভারতের ব্রহ্মবাদের প্রতিধ্বনি করে। কাশ্মীরে প্রাপ্ত 'দবিস্থান' নামক গ্রন্থের বিবরণ দিতে গিয়া ভারতের হিন্দুজাতির অস্তিত্বের কথা আসিয়া পড়িয়াছে; তাহাতে দেখা যায়, হিন্দু-রাজগণ খৃঃ পূঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যাক্ট্রিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন। ইহা হইতেই বৈদিক ভারত ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়াই কাল- নির্ণয় হয় না। ভারতের প্রাচীন যুগের তল-নির্ণয়ে মানুষের চেষ্টা যেখানে পৌছিতে পারে, সেই পরিধিটুকু ভারতের প্রাচীনত্বের পরিমাণ নয়, গভীর

সমুদ্রের ন্যায় প্রাচীন ভারতের সভ্যতা অতলস্পর্শী। আমরা বলিব, আটত্রিশ লক্ষ বিরাশী হাজার নয় শত সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক যুগ প্রবর্ত্তিত ছিল। কৃতযুগের পরিমাণ সতের লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর; ভারতে বৈদিকযুগের ইহাই যথার্থ পরিমাণ। যে সভ্যতা এই দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা ভাঙ্গিতে সতের লক্ষ ষাট হাজার বৎসর লাগিয়াছে। ত্রেতায় বৈদিক সভ্যতার একপদ, দ্বাপরে দ্বিপদ, কলিতে ত্রিপদ ভঙ্গ হইয়াছে—সে কি বিশাল সভ্যতা, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

ইহা পৌরাণিক যুক্তি বলিয়া উপেক্ষা করার বৈজ্ঞানিক নজির থাকিলেও, মাহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে ভারতের প্রাচীনত্ব-নির্দ্ধারণের সে সকল উপাদান বাহির হইতেছে, তাহাতে অতীতের গবেষণামূলক ভারত-সভ্যতার কালনির্ণয়ের বেদী ভাঙ্গিয়া যায়। সে যাহা হউক, ভারত-সভ্যতার কালনির্ণয় আমাদের লক্ষ্য নহে। ভারত এমন এক শিক্ষা-সভ্যতা-আদর্শের জননী, যাঁর পীযুষ-স্তন্যে অমৃত নির্ঝর ঝরিয়াছে, জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে। কত যুগ ধরিয়া সে সভ্যতার মর্ম্মর-মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না, তবে তাহার ভঙ্গদশা আমাদের চক্ষের সম্মুখে।

ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে ভারত-সভ্যতার কাল নির্ণয় মাত্র পাঁচ ছয় হাজার বৎসর হইলে দেখা যায়, একটা বিপুল আদর্শবাদের সত্যতাপ্রমাণের প্রচেষ্টার ইহা যুগ; ভারতের লক্ষ্যনির্ণয় ইহার কত পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা অভাবনীয় রহস্য।

ভারতের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান—তদনুকূল কর্ম্ম ও শিক্ষা-সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল; এই আদর্শবাদে ভারতে একটা জাতি গড়িয়া

উঠিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণ-জাতি। এই সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ-সৃষ্টি গোড়া হইতেই দেখা যায়। বৈদিক-ভারতেও সংগ্রাম, সংঘর্ষ কম হয় নাই—ইহা সভ্যতারই সংঘর্ষ। ভারতের অটুট আদর্শের বেদী এক এক পদ করিয়া ভগ্ন হওয়ার হেতু আর অন্য কিছু নয়, ভারতের আদর্শবাদের সহিত অন্যের সমাহার-চেষ্টা। দেবতারাই এই সভ্যতার একমাত্র অধিকারী হইয়া থাকিবেন, জগতের তাহা রীতি নহে; অন্যের তাহাতে অধিকার-বিস্তারের চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। ভারতে চিরযুগ ধরিয়া তাহার অন্যথা হয় নাই। দেবতার সভ্যতা অসুরের বস্তু হইয়াছে, ব্রাহ্মণের আদর্শ ক্ষত্রিয় অধিকার করিয়াছে—ইহাতে ভারত-সভ্যতার ব্যাপ্তিই ঘটিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিকযুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা এই পাঁচ হাজার বৎসর ভারতে যে বিবর্ত্তনধারা লক্ষ্য করি, তাহাতে দেখা যায়, এদেশে যে জাতি কৃতযুগে অটলস্থায়ী-রূপে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সভ্যতারক্ষার অধিকারী বলিয়া নিজেদের বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, তাহাদের কুক্ষি হইতে ভারতের অন্যান্য জাতি সে আদর্শকে দেশব্যাপী করার চেষ্টা করিয়াছে।

ভারতে এক বিপুল জাতিগঠনের প্রচেষ্টা অনাদি যুগ হইতে দেখা যায়। যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই সত্যের পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি নহে, তাহা নিখিল মানবজাতির আশ্রয়ক্ষেত্ররূপে সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে নাই—সনাতনের কল্পপ্রতিমা ভারত নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই—তাই তাহা আবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়া যায়, ভাঙ্গার সঙ্গে যে গড়ার ব্যবস্থা না চলিয়াছে তাহাও নহে; নতুবা কলির পর পরিপূর্ণ সত্যের কৃতযুগ প্রবর্ত্তনের ভবিষ্যদ্বাণী ভারতের পণ্ডিতগণের কণ্ঠে উচ্চারিত হইবে কেন?

কর্লিতে প্রাচীন-সভ্যতার চতুষ্পদ ভঙ্গ হইলেও, ইহার অভিনব, ঋতময়, অধিকতর বিরাট্ কলেবর গড়িয়া উঠিবে, বিশাল ভারতজাতিই মাথা তুলিবে।

জাতি বলিতে ভারতে ব্রহ্মণ্যজাতিকেই বুঝাইত; কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান এই সভ্যতার মর্ম্মকেন্দ্র-রূপে নির্ণীত হইয়াছিল। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" ভারত-সন্ততির উপাধি-স্বরূপ; সত্যই তাহারা আনন্দের সন্তান—শিক্ষা, বিজ্ঞান, ভোগ, অধিকার, পার্থিব কোন বিষয় কেন্দ্র করিয়া তাহারা সংহতিবদ্ধ হইতে চাহে নাই; ভগবানকেই তাহারা চাহিয়াছিল, অথবা ভগবান চাহিয়াছিলেন তাঁর অনির্ব্বচনীয় ভাব ও আনন্দকে মর্ত্ত্যের উপর মূর্ত্ত করিতে এবং উপরের সঙ্কেত ধরিয়াই ভারতের রাজ্য, সমাজ, জাতি, সব কিছুর সৃষ্টি।

এই বিশাল সৃষ্টি কত যুগ ধরিয়া গড়ার বস্তু, তাহা পাশ্চাত্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীববিশেষেরা বুঝিবে না, বুঝিবার প্রয়োজন নাই। অফুরন্ত আনন্দের শিহরণে ভারতে যে বৈচিত্র্যবিকাশ, তাহার মধ্যে এক অদ্বয় চেতনার জ্ঞান স্থির রাখিয়া যে জাতি ভাগবতরাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সে জাতিকে নিঃশেষ করা কালের সাধ্যে কুলায় নাই—তুচ্ছ মনুষ্যের অন্ধপ্রচেষ্টা! ভারত এই ক্ষেত্রে নির্ভীক।

তার এই নির্ভীকতার ইতিহাস বিগত পাচ হাজার বৎসরে দেখা যায়। রাজ্যবিবর্ত্তনে ভারতের সেই অদ্বয় ব্রহ্মবিজ্ঞান পরিম্লান হয় নাই; তবে বৈদিক-ভারতের জ্ঞানানুশীলনপ্রবৃত্তি বৌদ্ধযুগে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ভিন্নমুখী হইয়া পড়িলেও, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নিগূঢ় পথেই ভারত অভিযান করিয়াছে। খৃষ্টীয় দুইশত শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত আত্মদ্রোহী হইয়াছে। বৈদিক-সভ্যতার বেদী-

ভঙ্গ হওয়ায়, এই সঙ্কট যুগেই অভারতীয় সভ্যতায় ভারত প্লাবিত হয়; কিন্তু তবুও ভারতের ব্রহ্মণ্য-সভ্যতা অন্তর বাহিরের বিপ্লব সামলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই সময় হইতেই ধারাবাহিক-প্রবাহে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পঞ্চোপাসকগণের আবির্ভাবে হিন্দু-সভ্যতার প্রাধান্য রক্ষা পাইয়াছে; শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নানা ধারায় বিশ্লেষণ করিয়া ভারতের প্রাণ ব্রহ্ম-জ্ঞানাপ্লুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুসলমান আক্রমণ-কালে ও শাসন-কালেও এই বৈদিক-সভ্যতার প্রবাহ রুদ্ধ হয় নাই; বল্লভাচার্য্য, বলদেব, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতি আচার্য্যগণের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করি।

দশম শতাব্দী হইতে এই বিংশ শতাব্দী প্রায় এক-হাজার বৎসর ভারতে আত্মরক্ষার অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং তাহা যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহা বর্ত্তমান যুগের নিদর্শন দেখিয়া অনায়াসেই আমরা অনুমান করিতে পারি।

মুসলমান অধিকার-কালে ভারতের ধর্ম্মরক্ষায় অসংখ্য মহাপুরুষগণের আবির্ভাব লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, পরাধীনতার পীড়নে এ জাতি নিশ্চিহ্ন হইতে চাহে না এবং তাহার লক্ষণ দেখা যায়, যে অভারতীয় উপাদান আত্মসাৎ করার সঙ্গে ভারত আত্মবৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে না। ইউরোপের প্রাচীন জাতি-সমূহের যে পরিণতি ঘটিয়াছে, ভারতে এই আড়াই হাজার বৎসরের অন্তবিপ্লবে তাহার অন্যথা হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ। রোমের সভ্যতা ও আদর্শবাদের পীড়নে প্রাচীন ইউরোপ আজ নিশ্চিহ্ন; ভারত কিন্তু ভারত হইয়াই আজও বাঁচিয়া আছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে ভারতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষার অভিনব কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে; ব্রহ্মণ্য আচার ও আদর্শের কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার বিধান কথঞ্চিৎ শ্লথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা গ্রহণের যুগ। একদিন ভারতের গণ্ডী-মধ্যে স্বজাতির সংঘর্ষে যে আদর্শবাদ ভারতজাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়ার স্পষ্ট দাবী ছিল, এই সময়ে অবস্থাচক্রে নিখিল জগৎকে তাহা দিতে ভারত সারা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া ঘরে ডাকিয়াছে। সে এই যুগে দাতা; দেওয়ায় অকুণ্ঠ বলিয়া সে মূর্খ নহে, ইহা তাহার যুগোপযোগী আত্মপ্রকাশের অব্যর্থ নীতি। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেন—"Hinduism has always been pliable and aggressive." কোন যুগে হিন্দুধর্ম্মে ইহার অন্যথা দেখা দেখা যায় নাই। যখনই ভারতের উপর আক্রমণ আসিয়াছে, তখনই ভারত আপনাকে আক্রমণকারীর উপর নিজের সবখানি লইয়া নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে। এই নীতি বড় সাংঘাতিক নীতি। ইহাতে সে তাহার জীবনীশক্তির অনুকূল যাহা, তাহা নিঃশেষে গ্রহণ করিয়া, যাহা পরিত্যজ্য তাহা অন্তঃসারশূন্য-রূপেই ছাড়িয়া দিয়াছে। যখন এই নীতি অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে, তখন ভারত কমঠব্রতী, প্রাণহীন জড়ের ন্যায় অবস্থান করিয়াছে।

এই উভয় পথেই ভারতকে আমরা মুসলমানের ভারত অধিকার-কালে অগ্রসর হইতে দেখি। রামানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের অসাধারণ শক্তি ও তপস্যার ফলে ভারতে ভাগবতজ্ঞান অপ্রতিহত প্রবাহে যেমন বহিয়াছে, অন্যদিকে তদ্রূপ শ্রীহর্ষ, রঘুনাথ, শঙ্কর মিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ ভারতের হিন্দুত্বের দুর্গদ্বার রক্ষা করিয়াছেন।

যুগ-প্রয়োজন

রামানন্দের দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য ছিলেন; ইঁহারা নানা জাতির লোক; কবীর মুসলমান, তিনি রামানন্দের শিষ্য। কৃষক, কাঠুরিয়া, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে তিনি ব্রহ্মানন্দের অমৃত পরিবেশন করিয়া ভারতের শিরায় শিরায় ব্রহ্মজ্ঞানই সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, উত্তরভারত রামানন্দের তপঃপ্রভাবে মুসলমান-যুগেই প্রদীপ্ত প্রাণে মাথা তুলিয়াছিল। হিন্দুর গৌরব-যুগের উন্মেষ হইতে না হইতে ইউরোপের অতিথি ভারতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল; ভারতের আত্মা তাহাকেও আদর করিয়া ঘরে আসন বিছাইয়া দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী ভারতের বিস্মৃতি-যুগ। দীর্ঘ শ্রমের বোধহয় শ্রান্তি আসিয়াছিল। আমরা এই শতাব্দীতে ভারতের আদর্শে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছি; অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে ভারতের অমর বীর্য্য নিখিল জগতের চরম আশ্রয়ক্ষেত্র; আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে তপস্যাই ভারতের শক্তি, ত্যাগই ভারতের ধর্ম্ম; আর এই ধর্ম্মের শাশ্বত-মূর্ত্তিস্বরূপ এই পৃথিবীর সৃষ্টি। সৃজনের পশ্চাতে এই মহতী ইচ্ছা ভারত অবধারণ করিয়াছে এবং ধর্ম্মের প্রতীকরূপে ব্যষ্টিকে, সমষ্টিকে, দেশ ও জাতিকে গড়িতে চাহিয়াছে—সে তপস্যা ভারতের শেষ হইবে কিরূপে! ইহা যে মূলের ইচ্ছা—অমরত্বের এই উৎসমূলে ভারতজাতি যে অভিষিক্ত হইয়া অমর হইয়াছে! বিশ্বাসী, ভক্তের মৃত্যু নাই, ভগবানের কণ্ঠে অভয়বাণী এখনও শুনা যায়—"ন মে ভক্তঃ বিনশ্যতি"।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত জড়বাদী হইয়াছে, ভোগবাদী হইয়াছে, স্বার্থকে জীবনের কেন্দ্র করিয়াছে; ইহা অর্ব্বাচীন যুগের

সভ্যতা। ভারতের তপস্যা-যুগে আবার যে সৃষ্টি গজাইয়া উঠিল, তাহাকে দিব্য ভাগবত করার আকুলতায় সে নূতন বিশ্বটাকে নিকটে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, এই সঙ্কট বাহ্যদৃষ্টি দিয়া দেখিলে নিদারুণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত। এই নীতি আশ্রয় করিয়া সে মহাভারত সৃষ্টি করিতে চায়। বিচার করিয়া দেখিলে ভারতের অসংখ্য সন্ধিযুগে এইরূপ বহু সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। দেবগুরু বৃহস্পতিকেও নহুষের পাল্কী বহন করিতে হইয়াছে, দেবসম্রাজ্ঞী শচী দেবীকে দাসীবৃত্তি করিতে হইয়াছে। ভারত আজ বলীবর্দ্দ, বিশ্বের ভার-বহনে অকাতর; সে যে আপনাকে সীমার মধ্যে দেখার যুগ শেষ করিয়াছে! তার আত্মদৃষ্টি প্রসন্ন, রাগদ্বেষহিংসাহীন দৃঢ়চিত্তে সে স্বকার্য্যসাধনে উদ্যত। এ জলতরঙ্গ বুঝি রোধ করা যায় না!

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের উপর যেমন গভীর মেঘসঞ্চার হইয়াছে, বজ্রধর দেবরাজ ইন্দ্র সে বৃত্রাসুর-হননে দধীচির অস্থি দিয়া ব্রহ্মাস্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সৃষ্টির কল্পবীজ-ধর্ম্ম প্রকাশের শক্তিযুক্ত। ধর্ম্ম যে জগতের প্রাণ, ইহা মায়াবচ্ছিন্ন জীবের চেতনায় উন্মেষিত হইতে কত কোটী বৎসর যে শেষ হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ভারত যে দিন—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ" বলিয়া জলদগর্জ্জনে প্রশ্ন তুলিল, সেই দিন সে জগতের উদ্দেশ্যাবধারণে নিত্য সন্ন্যাসের ব্রতধারী হইল; তাহাকে বিচার করিতে হইল "কোঽহয়ং"—কে আমি, কে ইহারা, কাহা হইতে আমাদের উৎপত্তি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়াই ভারতের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, আর ইহার বিচার বিশ্লেষণে জ্ঞানতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজি

রচিত হইল। কোথায় লাগে এই গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থের তুলনায় ইউরোপের Epistimology, Cosmology, Ethics, Politics, Psyco-analysisy, Sociology; কিন্তু ভারতের বিকৃত অনুবাদ গলাধঃকরণ করার যুগে অতিশয় কুপথ্যকেও সুস্বাদু বলিয়া উপভোগ করিতে হয়। ভারত নীলকণ্ঠ শিবের মত পৃথিবীর গরল নিঃশেষে পান করিয়া অমৃতের অধিকারই জাতির হস্তে অর্পণ করে; সে অমৃতকুণ্ড উৎসৃত হইল দক্ষিণেশ্বরে, পাশ্চাত্য আলোকবর্জ্জিত, নিরক্ষর, দিব্যোন্মাদ ভাগবত পুরুষের চরণে। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানা বিজ্ঞানপ্রমত্ত উদীয়মান তরুণ গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—মূঢ়তা ঘুচিল, শতাব্দীর অন্ধতা বিদীর্ণ হইল। সে জয় ভারতের আত্মসংবিৎ-পুনঃপ্রাপ্তিরই জয় নয়, ধর্ম্মবলে বিশ্বজয়ের সূচনা হইল। তারপর বাংলায় পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতিক্রিয়া—স্বদেশী আন্দোলন। চিরোল সাহেব ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"......What is perhaps most important for us to note is that, whenever political agitation assumes the most virulent character, there the Hindu revival also assumes the most extravagant shapes." "আমাদের ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, যে যখনই রাষ্ট্রান্দোলন ভীষণ মাত্রায় মাথা তুলিয়াছে, তখনই অতি মাত্রায় হিন্দুর জাগরণই ঘটিয়াছে।" ইহার কারণ, ভারতের আন্দোলন রাষ্ট্রকে উপলক্ষ করিয়া, পরন্তু ভারতে ধর্ম্মই আজ মূর্ত্তি লইতে চায়; সে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। অহঙ্কার ও বাসনার ক্ষয়ে ইহাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে—সে যে জাতি, যে ধর্ম্মীই হউক, হিন্দুত্ব জীবের শেষ পরিণাম, জীবনবেদের ইহাই পরমাস্তভাগ।

দক্ষিণেশ্বরে ধর্ম্মের জয়শঙ্খ যে ধ্বনি তুলিল, তাহা বিশ্ববাসীর কর্ণে গিয়া পৌছিল। বাংলার আন্দোলন পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আজ অনাবৃত আকারে ধর্ম্ম রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাংলার ঋষি অরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে—"Religion and Politics, the two most effective and vital expressions of the nation's self having been nationalised, the rest will follow in due course." অর্থাৎ জাতির জীবনপ্রকাশ রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে; ইহা যদি ভারতের জাতীয়তায় স্থান পায়, অবশিষ্ট যাহা কিছু প্রয়োজন স্বতঃই আবির্ভূত হইবে।

এক সুরে ভারত-সঙ্গীত আজ ভারতীর বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কৃত। ভারত মহাদেশ বটে; কিন্তু এক জাতি, বিরাট্ জাতি—সনাতন ধর্ম্ম ইহার আশ্রয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আঘাতে ভারতের সর্ব্বত্র জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল; বাংলায় হিন্দু-ধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়িবার সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ ভারতের একদিকে ব্রাডলফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী পাশ্চাত্যের ধর্ম্মনীতির উপর অকাতরে মসীলেপন করিয়া ইহার মোহ-ভঙ্গ করিতেছিলেন; অন্য দিকে মাদাম ব্লাভট্স্কি ও কর্ণেল অলকট হিন্দুত্বের অলৌকিক রহস্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া হিন্দুজাতিকে আত্মধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে একজন রাজকর্ম্মচারী হইয়াও দাক্ষিণাত্যের উদীয়মান তরুণের এক সংহতি গঠন করেন; বাংলায় রামমোহন, কেশব যে প্রাণ এখানে সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারই দ্যোতনা তিনি দাক্ষিণাত্যে ছড়াইয়া

দেন। ধর্ম্মগুরু রামদাসের অগ্নি-প্রেরণা মহারাষ্ট্রে নিভিয়া যায় নাই; ইহা ব্যতীত চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে মহারাষ্ট্রে যে সকল ভক্ত মহাবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম ম্লান হইতে পারে নাই। শ্রীবিঠলদেব, নামদেব, গোরা প্রভৃতির মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন ও ভজন, দাক্ষিণাত্যবাসীর মর্ম্মবীণায় নিত্য ঝঙ্কার তুলে; তুকারামের তপস্যাও মহারাষ্ট্রবাসীকে স্বধর্ম্মরক্ষায় সহায়তা করিয়াছে। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ইংরাজের উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার প্রতি সম্মান-বোধ স্বাভাবিক। তিনি এই ধর্ম্মগুরুগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করিলে সমগ্র চিন্তাশীল তরুণের দৃষ্টি আপাতোজ্জ্বল পাশ্চাত্যের আদর্শ ও সভ্যতার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। পাঞ্জাবের দয়ানন্দ সরস্বতীর নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দুভারতের পুনরুত্থান-কামনায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র জ্বালাময়ী ভাষায় জাতিকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দেন এবং হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া ইহার ভাস্বর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তুলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুজাতিকে গ্রাস করার যে বিজয়ী সভ্যতা মুখ ব্যাদান করিয়াছিল, ভারতীর বীণাযন্ত্রে সহস্র তারে মধুর মূর্চ্ছনা উঠায়, তাহা নিরস্ত হইল। বিংশ শতাব্দীতে আমরা হিন্দুর অভ্যুত্থান-যুগের পরিপূর্ণ আভাস পাইতেছি।

কলিযুগে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ত্রিপদ ভঙ্গ হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু ভবিষ্য-যুগের জন্য যে অভিনব হিন্দুসভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে, দৃষ্টিহীন তাহা দেখিবে না। পুরাতন প্রাকার ভাঙ্গিতেছে, নূতন ভারতের স্থান সংকুলান না হওয়ায়; স্থিতিশীল সমাজ আজ অন্তর্দৃষ্টিহীন, এইজন্য আত্মার গতি লক্ষ্য করিতেছেন না, সনাতন-ধর্ম্মী

বলিয়া তাঁহাদের গর্ব্বে আঘাত পড়িতেছে। হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করার দরদ ইঁহাদের প্রশংসনীয়; কিন্তু ধর্ম্মের শক্তিকে কোন বিশিষ্ট জাতিসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। শ্রীঅরবিন্দের কথা এখানে সমধিক প্রযুজ্য—"In all life, there are three elements—the fixed and permanent spirit, the developing yet constant soul and the brittle changeable body. The spirit we cannot change." "জীবনে তিনটী উপাদান লক্ষ্য করা যায়; প্রথম শাশ্বত সনাতন চিৎ বা সত্তা, দ্বিতীয় নিত্য অথচ প্রগতি-প্রবণ আত্মা এবং তৃতীয় পরিণামী ক্ষণভঙ্গুর আশ্রয়-ক্ষেত্র। সত্তার পরিণাম নাই।" ইহা উপনিষদের সত্য। সনাতন ভারত অচল হিমাদ্রির ন্যায় স্বপ্রতিষ্ঠ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আত্মকেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়া বিরাটকে শনৈঃ শনৈঃ নব নব রূপে রসে গড়িয়া তুলিতেছে। এই প্রবাহের আশ্রয়ক্ষেত্র মরস্বভাবসম্পন্ন; নতুবা সত্তার ক্রম-বিস্তৃতির বিপুলতাকে ধারণ করিবার তাহার আর কি কৌশল, কি বিজ্ঞান থাকিতে পারে? এই অব্যর্থ নীতির অনুগত হইয়া ব্যষ্টি-সমষ্টির উত্থান পতন ঘটে, জন্ম-মৃত্যুর নাগরদোলায় ভুবন নৃত্য করে। এই চাঞ্চল্য ভাগবত প্রকাশের নৃত্য-চঞ্চল মাধুর্য্য, অপরূপ সৌন্দর্য্য। বিশ্ব হিন্দোলিত—আনন্দ-পুলকে নব নব ছন্দে নিত্য নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে।

ভারতের সত্তা আজ জাগিয়া উঠিতেছে। একদিন দধীচির অস্থি দিয়া ভারতের সভ্যতারক্ষার বজ্র নির্ম্মাণ হইয়াছিল, আজ মহাত্মার অস্থি-মজ্জায় ভারত-ধর্ম্মের দিব্য প্রাসাদ হয়তো গড়িয়া উঠিবে। ইহা সত্তার ধর্ম্ম, শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে আশ্রয় পায়। মহাত্মা গান্ধীকে

ভারত-সত্তা যে অভিনব ভঙ্গীতে আশ্রয় করিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

বাংলায় দক্ষিণেশ্বরের পর যে হৃদয়, যে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল, বাঙ্গালী জাতির মধ্য হইতেই ভারতে সেই মহানেতার আবির্ভাব হইবে, যাঁহার ভিতর দিয়া ভারতের হিন্দুত্ব স্বরূপ লইয়া দেখা দিবে। বিধাতার কল্পে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীই চিহ্নিত হইয়াছিলেন। আমরা এক অভাবনীয়ভাবে তাঁহাকে ভারতের প্রতীক-রূপে আবির্ভূত হইতে দেখিলাম।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির অব্যাহত গতি রক্ষা করিয়াছেন শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্বদেব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ। ইঁহারা কেহই নূতনের দাবী করেন না, আপনাদিগকে পুরাতন ভারতের আদি সভ্যতার বাহন বলিয়া স্বীকার করেন। বিধ্বস্ত ভারতসভ্যতার মস্তিষ্ক-গঠনের ইঁহারা বিধাতৃপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর তুকারাম, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে ভারত দিব্য হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছে; দক্ষিণেশ্বরে এই মস্তিষ্ক ও হৃদয় সংযুক্ত হইয়া নব জাতির বিগ্রহ সৃষ্ট হইয়াছিল, অখণ্ড প্রাণের চেতনায় সে প্রাজ্ঞমূর্ত্তি জীবনের স্পন্দন তুলে নাই। আমরা দক্ষিণেশ্বর-তীর্থে প্রতিমাদর্শনের ন্যায় ভারতের হৃদয় ও মস্তিষ্কের দিব্য রূপটাই সন্দর্শন করি। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ভারতীয় মেধা, হৃদয় আজ দিব্য প্রাণ-স্পর্শে প্রবুদ্ধ, এখানে হৃদয় ও মস্তিষ্ক স্বতন্ত্র করিয়া দেখার অবকাশ নাই, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সংযুক্ত আকারে ইনি আবির্ভূত। আমরা এই নরদেবতার চরণে এইজন্য বার বার প্রণতি জ্ঞাপন করি।

অনশনে মহাত্মা

ভারতের বিগ্রহ আজ দিব্যপ্রাণ-সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ, এইবার তার সমাজ চাই, শিক্ষা চাই, জাতি, দেশ, ধর্ম্ম-প্রকাশের ক্ষেত্র চাই; তাই এক হস্তে সৃষ্টির খনিত্র, অন্য হস্তে ধ্বংসের বজ্র লইয়া মহাত্মার আবির্ভাব—শিবের কল্যাণময় শ্রী তাঁহার সহিত বিজড়িত; এই হেতু নয়নে রোষানল নাই, করুণায় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে, ললাটে ভ্রূকুটী নাই, প্রসন্ন-দৃষ্টি শত্রুর হৃদয় স্নিগ্ধ করে, দন্তে ওষ্ঠপুট নিপীড়িত নয়, বিশুদ্ধ শুভ্র হাস্যের সুধারাশি উথলিয়া উঠে। এই স্বয়ংপ্রকাশ ভারতের ভাগ্যদেবতাকে তাই বার বার নমস্কার করি।

দুই শত কোটী বৎসরের প্রাচীন ভারতের অমর সভ্যতা তাঁর মধ্যে লীলায়ত হইয়া উঠে, তাঁর অমর আত্মাই ইহার আশ্রয়; তাই নূতন সভ্যতার দায়ে তাঁর বিশুদ্ধ চৈতন্য এক মুহূর্ত্ত মূর্চ্ছিত নহে। নূতন কিছু করার অভিমান হিন্দুর নাই, হিন্দুধর্ম্মীর নাই, কল্পারম্ভে বিধাতার অমোঘ ইচ্ছার প্রবাহে যুগে যুগে অতিমানুষের আবির্ভাব; সেই কল্পবিধৃত সত্যকেই রূপ দিতে যুগে যুগে আত্মার জন্ম হয়। মহাত্মার জীবন-মর্ম্ম একজন বৈদেশিক মনীষী যেমন করিয়া বুঝিয়াছেন, অনেক আত্মাভিমানী হিন্দুর পক্ষে তাহা তেমন করিয়া বুঝার অবকাশ ঘটে নাই। সবরমতীর ঋষির এই বাণী মহাত্মার জীবন-মন্ত্র বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করেন :—

"I pray like every good Hindu. I believe we can all be messengers of God. I have no special revelation of God's will. My firm belief is that He reveals himself daily to every human being, but that we shut our ears to the "still small voice......"

I claim to be nothing but a humble servant of India and humanity. I have no desire to found a sect. I am really too ambitious to be satisfied with a sect for a following, for I represent no new truths. I endeavour to follow and represent truth as I know it. I do claim to throw a new light on many an old truth."

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক খাঁটী হিন্দুর ন্যায় প্রার্থনা করি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের বাণী বহন করিয়া জন্মিয়াছি। ভগবানের কোন বিশেষ ইচ্ছার আমি প্রকাশক্ষেত্র নহি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান আমাদের মধ্যে নিত্য প্রকাশিত হইতেছেন, আমরা তাঁর এই নিগূঢ় মন্ত্রধ্বনি কাণে আঙ্গুল দিয়া শুনিতে বিরত আছি। আমি ভারতের সেবক, মানবজাতির সেবক, ইহা ভিন্ন অন্য কামনা আমার নাই, কোন সম্প্রদায় গড়ার আকাঙ্ক্ষাও রাখি না। আমি কোন নূতন সত্য জ্ঞাপন করিতে আসি নাই বলিয়া সম্প্রদায়-সৃষ্টি করিয়াও পরিতুষ্ট হইতে পারি না। সত্যকে যেমন ভাবে বুঝিয়াছি, তাহারই অনুসরণের চেষ্টা, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস করি; তবে প্রাচীন সত্যের উপর নূতন আলোকপাতের দাবী আমার আছে।"

অনাদিযুগের সত্যটী এই কথা কয়টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্পারম্ভে ভগবান নিজেকে বহুর মধ্যে ছড়াইয়া দিতেই সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলেন; তিনিই সৃষ্টির মাঝে রূপবন্ত হইবেন, আমি নহি। যে আড়াল 'আমার' ও 'তোমার' মাঝে পড়িয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতেই ভারতের ধর্ম্মসাধনা, বেদান্তের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সমস্যার

মীমাংসা করিতে ভারতে যে শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধমন্ত্র দিয়াছেন—"মামেতি", ভগবানে সব উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হও, ভাগবত জীবনের সন্ধান পাইবে। ভারতে তাই কর্ম্ম আছে, কর্ম্মফলভোগের অধিকার নাই। এই আত্মসমর্পণের যোগ ও সাধনা অনাদিযুগ হইতে ভারতে প্রবর্ত্তিত; হিন্দুসভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা এই যোগধারা বহন করিয়া আজ অবতীর্ণ। ইহা নূতন কিছু নহে, ভারত এইরূপ পুরাণ-পুরুষের সাক্ষাৎ যুগে যুগে পাইয়াছে।

যুগধর্ম্ম আজ জাগ্রত, ভারতের আত্মা আজ যুগ প্রয়োজনে সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মহাত্মার মধ্যে এই চেতনা সতত জাগ্রত দেখা যায়; তাঁর প্রতি কর্ম্মে, কথায় এই চেতনাই প্রকাশ পায়। বাংলার ভক্তপ্রাণ কৃষ্ণদাস তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি এই চেতনারই অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন—"the spirit of the Lord is come to Hindusthan, has it not!"—হিন্দুস্থানে ভাগবত চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে, নয় কি!

হিন্দু-ভারতের মর্ম্মবীণায় যে সনাতন সুরের ঝঙ্কার অনাদিকাল হইতে বাজিতেছে, সেই অনাহত পাঞ্চজন্যের নিনাদ তাঁর কণ্ঠে শত সহস্র বার শুনিয়াছি। যুগধর্ম্মীর এই কথাগুলিতে তাহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়:—

"The movement of the spirit which we wanted to inaugurate in the country was undoubtedly based on old Indian ideals, nevertheless it was his intention to give it a new orientation."

যুগ-প্রয়োজন

"ভারতের প্রাচীন আদর্শবাদের উপরই আমরা দেশে যে ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তন করিতে চাই তাহার ভিত্তি; উপরন্তু ইহা দিব্য অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করুক, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।" সনাতন হিন্দু ভারতে প্রাচীন আদর্শবাদ যে লঘুচিত্ত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক পুরাতন বনিয়াদ বলিয়া উপড়াইয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন, এই যুগ-পুরুষের আবির্ভাবে তাহার অসারত্ব প্রতিপাদিত হয়। জড়বাদের প্রতিবাদ দক্ষিণেশ্বরে অলৌকিক ভাবে সিদ্ধ হইতে দেখিয়াছি। ভারতে হিন্দুধর্ম্ম মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল; মহাত্মা নিখিল ভারতে, বিশ্ব-জগতে তাহার অমর প্রভাব ঘোষণা করিয়া ভারতের ধর্ম্মই রক্ষা করিতেছেন। যুগের বাণী ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মই এ জাতির মর্ম্ম, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। মহাত্মা যুগসিদ্ধ মহাপুরুষ —ইহা অবিসংবাদিত সত্য, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছে।

মহাত্মার জন্ম ও কর্ম্ম

যে পুণ্য-কাহিনী আজ ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত, সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব।

মহাত্মা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর প্রদেশের পোড়বন্দর বা সুদামপুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী, মাতার নাম পুতলীবাঈ। তিনি পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত কোনরূপ অলৌকিক রহস্যপূর্ণ নয়, অল্পশিক্ষিত পিতার চতুর্থ পক্ষীয় পত্নীর গর্ভে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার পিতা রাজকোটের প্রধান সচিব ছিলেন। বংশানুক্রমে মহাত্মার পূর্ব্বপুরুষগণ গন্ধবণিক্-বৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাব পিতামহ কাথিয়াওয়ার রাজ্যের বিভিন্ন ষ্টেটে দেওয়ানী কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। করমচাঁদ গান্ধী পিতৃবৃত্তির অনুসরণ করেন। তিনি শক্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। একবার একজন সহকারী পলিটিকেল এজেণ্ট রাজকোট ষ্টেটের নিন্দা করিলে, তাহার সদম্ভ প্রতিবাদ করায়, এজেণ্ট বাহাদুর করমচাঁদ গান্ধীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন; তিনি তাহাতে অসম্মত হন। এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে কয়েক ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অদমনীয় চরিত্রের পরিচয় পাইয়া শেষে এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

মাতা পুতলীবাঈ ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি কোন দিন উপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না; দেব-দর্শন করা তাঁর দৈনিক কার্য্য

ছিল। ব্রত, উপবাস, নানাবিধ কঠোর তপস্যা লইয়া তিনি থাকিতেন। তাঁর ধর্ম্ম-সঙ্কল্প কোন কারণে ভঙ্গ হইত না; প্রতি বৎসর তিনি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেন, কোন বাধায় ইহা হইতে কখন বিরত হন নাই। একবার চন্দ্রায়ণ-ব্রত ধারণ করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু তবুও যথানিয়মে ব্রতরক্ষা করিয়াছিলেন। গান্ধী-জননী প্রতি বৎসর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালন করিতেন। একবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, যে সূর্য্য না দেখিয়া জলগ্রহণ করিবেন না; কিন্তু বর্ষার আকাশে প্রতিদিন সূর্য্যদর্শন হইত না, তাহাতে এক বিন্দু বিচলিত হইতেন না। মেঘের ফাঁক দিয়া সূর্য্য কখন প্রকাশ পাইবে, এই প্রতীক্ষায় তাঁর পুত্র-কন্যারা স্বতৃষ্ণ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত, সূর্য্য প্রকাশিত হইবামাত্র মাতাকে চীৎকার করিয়া তাহারা বাহির হইতে ডাকিত; তিনি বাহিরে আসিয়া হয়তো দেখিতেন, প্রাবৃটের গগনে সূর্য্য পুনরায় ঢাকা পড়িয়াছে, তিনি হাসিয়া বলিতেন —আজ নারায়ণের ইচ্ছা, আমি উপবাসে থাকি। তাঁর মুখে হাসি ফুটিত, গৃহকার্য্যে প্রফুল্লচিত্তে ব্যাপৃতা হইতেন। ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত পুতলীবাঈয়ের বিষয়-বুদ্ধিও প্রখর ছিল। মহাত্মা মাতার সহিত শিশুকালে বহুবার রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের বিধবা জননীর নিকট যাইতেন, কথাপ্রসঙ্গে জননীর ষ্টেট-সংক্রান্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইতেন। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ পিতা, বুদ্ধিশালিনী ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সন্তান মহাত্মা পিতা-মাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলিই আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বাল্যকালে মহাত্মার মেধা প্রখর ছিল না, কিন্তু সততা তাঁহার জন্মগত সদ্‌গুণ; তিনি সত্যকে জীবনের শৈশবকাল হইতেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি গুরুজনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন,

বয়োবৃদ্ধজনের দোষ দেখা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল না। এই সকল কথা বিশেষ বিবরণ সহ বুঝাইবার প্রয়াস করিব না, মহাত্মার স্বরচিত জীবনী হইতে পাঠক এই সকল বিষয় অকৃত্রিমভাবে অবগত হইবেন।

মহাত্মার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ হয়; তাঁর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী তাঁর সমবয়সী। পত্নীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য-বোধটা তাঁর খুব জাঁকাল রকমের ছিল; কেননা, তিনি গোড়া হইতেই ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন যে, "If I should be faithful to my wife, she also should be pleased to be faithful to me." "আমি যদি পত্নীর কাছে বিশ্বস্ত থাকি, সেও আমার বিশ্বাসী স্ত্রী হইয়া থাকিবে।" গুর্জ্জর প্রদেশে নারী-স্বাধীনতা আছে; কিন্তু পত্নীর উপর মহাত্মার কড়া শাসন ছিল। ইহার কারণ অন্য কিছু নহে, নিজের সত্য ও ধর্ম্ম পত্নীর নিকট হইতে আদায়ের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা মাত্র। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধীর উপর আদেশ হইয়াছিল, যে তিনি মহাত্মার আদেশ ভিন্ন কোথাও বাহির হইতে পারিবেন না। স্বামীর এইরূপ কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব তিনি স্বীকার করিতেন না; নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করিতেন। ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাময়িক কলহ ঘটিত, কথা বন্ধ হইত; কিন্তু প্রেম যেখানে মিলনের ভিত্তি, সত্য ও বিশ্বাস যে সম্বন্ধের মর্ম্ম, তাহা স্বভাবের বিবর্ত্তনে নিষ্ফল হয় না। স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী-রূপে শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ আজ ভারতের আদর্শ নারী।

মহাত্মার বাল্য-বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি দীর্ঘদিন একত্র স্ত্রীর সহিত অবস্থান করেন নাই। আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর কিশোর জীবনের কয়েকটী ঘটনা ভবিষ্য জীবনের

অব্যর্থ সঙ্কেতপূর্ণ ছিল। তাহা বড় কৌতুকপূর্ণ। আমরা তাহার কয়েকটী এইখানে বিবৃত করিব।

বিদ্যালয়ে পাঠকালে তাঁহার এক বন্ধু-লাভ হইয়াছিল। বন্ধুটীর উপর তাঁহার মাতা, ভ্রাতা এবং পত্নীর তেমন আস্থা ছিল না। তাঁহারা ইহাঁর সঙ্গ ত্যাগ করার অনুযোগ তুলিলেন, মহাত্মা বলিলেন—তাহার স্বভাব মন্দ, কিন্তু ভাল গুণ যে তাহার নাই এমন নহে; আমায় সে মন্দ করিতে পারিবে না, আমার সংসর্গে বরং সে ভাল হইবে, সে বড় হইবে। সংস্কার-চেষ্টা তাঁর বাল্যচরিত্র হইতেই পরিস্ফুট হইয়াছিল; কিন্তু সংস্কার সাধন করিতে হইলে যে শক্ত চরিত্রের প্রয়োজন, মহাত্মার সে চরিত্র তখনও গড়িয়া উঠে নাই। নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাঁর সে চৈতন্য হইয়াছিল।

ভারতের সর্ব্বত্র যে পাপ প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়া হিন্দুজাতির মূল ক্ষয় করিতেছিল, যে প্রভাবে বাংলার রাজনারায়ণ প্রভৃতি তরুণ বয়সে বিপথগামী হওয়ার পথে ধাবিত হইয়াছিলেন, রাজকোটে সংস্কারের নামে সেই একই প্রবৃত্তি হিন্দু তরুণের মনোবৃত্তি মলিন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাংস ও মদ্য না খাইলে যে জাতির দৌর্ব্বল্য দূর হয় না, এইরূপ যুক্তিতর্ক ছাত্রজীবনে অবাধে চলিত; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজ চরিত্র সম্মুখে ধরা হইত। তাহাদের আধিপত্য-বিস্তারের মূলে মদ্য-মাংসের শক্তিই নিহিত আছে, তাই তাহারা বীর ও অধ্যবসায়ী। ইংরাজ-চরিত্র অনুকরণযোগ্য, এই সিদ্ধান্ত তরুণের চিত্ত প্রলুব্ধ করিত। মহাত্মাও নিজের দৌর্ব্বল্যের দিকটা দেখিয়া ইহা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয় তাঁর এমনই প্রবল ছিল, যে অন্ধকারে তিনি বাহিরে পা বাড়াইতে

পারিতেন না; সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়া না রাখিলে তাঁহার নিদ্রা হইত না, কেবলই মনে হইত, অন্ধকার পিণ্ড পাকাইয়া ভূত, সাপ অথবা চোরকে চারিদিক হইতে ডাকিয়া আনিতেছে—তিনি ভয়ে চক্ষু মুদিতেন। অন্য পক্ষে শ্রীমতী গান্ধী বলিতেন—তিনি জীবন্ত সাপের লেজ ধরিয়া ঘুরাইতে পারেন, চোরকে ভ্রূক্ষেপ করেন না, ভূতের ভয় তাঁহার নাই। গান্ধী নিজের দৌর্ব্বল্যে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেন। যে বন্ধুটী মহাত্মার সঙ্গী ছিল, সে ইহা জানিত। একদিকে তাহার অকাট্য যুক্তিজাল, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়ায় মাংস ও মদ্যপানের অনুকূল অবস্থা—শিক্ষকগণের মধ্যেও কয়েকজন নাকি মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের কণ্ঠে হাততালি দিয়া গানও উঠিত—

"Behold the mighty Englishman
He rules the Indian small;
Because being a meat-eater
He is five cubits tall."

মহাত্মা শক্ত দেহ মন পাওয়ার আশায় গোপনে মাংস খাওয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিন্তু জানিতেন, গান্ধী-পরিবার বৈষ্ণব, গুর্জ্জরপ্রদেশের হিন্দু নিষ্ঠাবান্ অহিংস; এই দুর্নীতির কথা যদি পিতামাতার কর্ণগোচর হয়, তবে তাঁহাদের মাথায় বজ্রপাত হইবে, তিনি তাই সাধ্যমত এই কার্য্য গোপন করিয়া রাখিলেন। বিবেক আঘাত দিত, কিন্তু মনকে তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, যে একথা পিতামাতাকে না জানাইলেই হইল; এই দুর্ব্বল জাতিটাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্যাদির সংস্কার চাই। স্বরাজের স্বপ্ন সে সময়ে তাঁহার মনে না

আসিলেও, ইংরাজী শিক্ষায় স্বাধীনতার স্পৃহা চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। ভারতকে স্বাধীন করিতে হইলে ইংরাজের তুল্য শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন, এবং তাহার জন্য মদ্য মাংস খাদ্যরূপে প্রবর্ত্তন করা দোষের নহে। ভারতবাসীকে ফেরুপালের ন্যায় ইংরাজ যে শাসন করে, তাহা ভারতবাসী দুর্ব্বল জাতি, এই জন্য; ইহার প্রতিকার-কল্পে মদ্য মাংসের প্রচলন হওয়া উচিত, বন্ধুটিও এইরূপ বুঝাইতেন। মাংসাহারীরা কেমন সবল সুস্থ, তাহারা অনায়াসে বীরের ন্যায় লাফায়, ছুটাছুটি করে; আর ভারতবাসী মুমূর্ষু, শীর্ণকায়, দুর্ব্বল—মহাত্মা চক্ষের সম্মুখে ইহা দেখিয়া মাংসাহারে বেশ অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পাপ প্রশ্রয় পাইলে তাহার পরিণাম কোথায়, মহাত্মা তাহা আত্মজীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই কদাচার কুসঙ্গবশে শেষে তিনি গণিকালয়ে গিয়া পৌছিলেন। তিনি পত্নীর নিকট চিরবিশ্বাসী থাকার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সত্যের এই অগ্নি-পরীক্ষায় দৈবশক্তিই তাঁহার সহায় হইল। মহাত্মা এই মহাপাপের সম্মুখীন হওয়া-মাত্র তাঁর সমস্ত শরীর আড়ষ্ট পক্ষঘাতাক্রান্ত রোগীর ন্যায় অচল হইয়া পড়িল; তিনি নড়ন-চড়নবিহীন অন্ধ মূকের ন্যায় পতিতার শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁর মুখের কথা…"God in His infinite mercy protected me againt myself." "ঈশ্বরের অসীম করুণা বলেই সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।" মানুষ যখন দৈবশক্তির স্পর্শ পায়, তখন সে অসাধারণ জীবনপথে অগ্রসর হয়। তিনি এই দিন হইতে ধীরে ধীরে বিবেকের সঙ্কেত বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। জগতের পাপ তাঁহাকে বার বার বিপথে আনিতে চাহিয়াছে, তিনি-

দ্রুত তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছেন। বন্ধুর প্ররোচনায় স্ত্রীর প্রতি সংশয়, চুরি, আত্মহত্যার চেষ্টা সবই ঘটিয়াছে; কিন্তু দৈবানুগ্রহে এই সকলের ভিতর দিয়া আত্মার শিব ও কল্যাণময় মূর্ত্তিটাই তাঁর চক্ষের সম্মুখে যেন ভাস্বর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল, পৃথিবীর পাপপঙ্কিল ক্ষেত্র হইতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর দিব্য জীবনগতির ছন্দে ভারতের সত্তা পুলকিত হইল। মহাত্মার কর্ম্মজীবন অলৌকিক রহস্যময়।

মহাত্মার সহিত তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরও এই কুসঙ্গে পড়িয়া যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। মাংসাদি-ভোজনের নিত্য ব্যবস্থা করিতে যে ব্যয়, তাহা চুরি করিয়াই চলিয়াছে, বাহিরে ঋণও হইয়া গিয়াছে। টাকা পয়সা চুরি করিয়া আর কুলান হয় না; কাজেই ভাইয়ের স্বর্ণবলয় হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া এই দায় মিটিল—কিন্তু বিবেকের হাতুড়ি তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি এই অপরাধ গোপন রাখা দুঃসাধ্য মনে করিলেন; বাক্যের দ্বারা প্রকাশ সম্ভব নহে, আত্মদোষ লিখিয়া পিতাকে নিবেদন করিলেন।

পিতার চরিত্র তাঁহার জানা ছিল। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি কিরূপ ক্রুদ্ধ হইবেন, কি নিষ্ঠুর কটু তিরস্কার করিবেন, তাঁহার মাথায় কি গুরুতর প্রহার দণ্ড পড়িবে, এই সকল ভাবিয়া কম্পিতকলেবরে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তাঁর স্বীকৃতি-পত্রটুকু পড়িতে পড়িতে তাঁর পিতার নয়নদ্বয় দিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল; চক্ষু মুদিত করিয়া কি যেন ভাবিলেন; পত্রখানি পাঠের জন্য বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন, নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন,

তার পর বিছানায় পুনরায় শয়ন করিলেন। মহাত্মা দেখিলেন, নিদারুণ বেদনায় তাঁর পিতার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, মলিন হইয়াছে; ব্যথার ভারে তিনি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পিতার মনে এই কষ্ট তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অপার্থিব ক্ষমার স্পর্শে তাঁর হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! অহিংসা-মন্ত্রের আগুন তাঁর প্রাণে এই প্রথম প্রবেশ করিল। অপরাধের দণ্ড বিধান না করিয়া ক্ষমার অশ্রুপাতে হৃদয়ের মলা কিরূপে বিধৌত হয়, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। মহাত্মা অহিংসার বিজয়ী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া অহিংস-ব্রতধারী হইলেন। জীবনের এই পরিবর্ত্তন বিধাতার যেন অমোঘ বিধান-রূপে মহাত্মাকে এক মুহূর্ত্তে তাঁর স্বরূপের পথ দেখাইয়া দিল।

আর একটী ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিয়া আমরা তাঁর কর্ম্মজীবনের কথাগুলি সামান্য আলোচনা করিব।

যুবতী পত্নী—গর্ভবতী। পিতা অসুস্থ। প্রতি রাত্রে তাঁহাকে পিতার শুশ্রূষায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিতে হয়। সমস্ত হৃদয়খানি তাঁর শয্যাগৃহের দিকেই পড়িয়া থাকে; কর্ত্তব্যপালন ছাড়া পিতৃসেবায় এই অবস্থায় কোনরূপ আনন্দ ও শ্রদ্ধার উদয় হওয়া সম্ভব নয়, ইহা যেন দায় বলিয়াই তাঁহাকে করিতে হয়। একদিন রাত্রি দশটার পর মহাত্মা পিতৃসেবারত, তাঁহার পিতৃব্য আসিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। তিনি শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, পত্নী নিদ্রিতা। কিন্তু কোন্ নারী আমাদের দেশে পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারে! মহাত্মার পীড়নে তাঁহাকে জাগিতে হইল; তারপর কয়েক মিনিট পরেই ভৃত্য আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ

জ্ঞাপন করিল—মাথায় বজ্রপাত হইলেও, এত ব্যথা বুঝি বাজে না! এই দিন তিনি বুঝিলেন—পশুবৃত্তি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইতে মানুষকে বিমুখ করে। এই দিন কাম-বর্জ্জনের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল। কি দুঃসাধ্য তপস্যায় ইহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহা পরে বলিব। এই দুর্ঘটনার ভিতর দিয়া মহাত্মার ভবিষ্য-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি কলেজে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সকল বিষয়ই তাঁর নিকট দুর্জ্জেয়; তিনি নিজের অক্ষমতার কথা জানিতেন, বৎসরান্তে বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে বিলাতে প্রেরণ করার কথা উঠিল। মহাত্মার মনে ইহা নূতন আশার সঞ্চার করিল। কিন্তু বিলাতে স্বধর্ম্মরক্ষার ব্যবস্থা নাই, সমাজে ইহা লইয়া গোল বাধিল। তবে মহাত্মার ভবিষ্য-জীবনগঠনের পথে কয়েকজন হিতৈষীর সহায়তা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে গান্ধী-পরিবারের পরম বন্ধু জোসিজী একজন; তিনি মহাত্মাকে উৎসাহিত করিলেন। একজন জৈন সন্ন্যাসী সকল আপত্তি নিরসন করিয়া বলিলেন—গান্ধী তিনটী অঙ্গীকার পালন করিলে, বিলাত যাওয়ার বাধা হইবে না। প্রথম, সে মদ্য পান করিবে না, দ্বিতীয় মাংস ভক্ষণ করিবে না, তৃতীয় নারী গমন করিবে না। মহাত্মা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন, প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। গান্ধী-জননী সান্ত্বনা পাইয়া পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে সম্মত হইলেন। রাজকোট হইতে তিনিই প্রথম বিলাতযাত্রী; বিদ্যালয়ে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হইল। মহাত্মার জীবনের একাঙ্ক এইভাবে শেষ হইল।

বিলাতে শিক্ষা-জীবন

জাহাজে উঠিয়াই মহাত্মা উপদেশ পাইলেন, যে বিলাতে মদ্য মাংস গ্রহণ না করিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য। লোহিত-সাগর পার হইলেই এ কথা তাঁহাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে হইবে; কিন্তু মহাত্মা সে উপদেশের মর্ম্ম যে উপলব্ধি করেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে বিলাতে খাদ্যসমস্যা লইয়া তাঁহাকে বহুবার বিব্রত হইতে হইয়াছিল; শেষে তিনি নিরামিষ খাদ্যের হোটেল খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মাংস খাওয়ার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী আব্‌হাওয়ায় পুরা সাহেবিয়ানা হাব ভাব অভ্যাসের সমস্যাও বাড়িল। নৃত্য-সভায় যোগদান না করিলে সভ্যতা-রক্ষা হয় না; তিন পাউণ্ড খরচ করিয়া তাঁহাকে একখানি বেহালা খরিদও করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মহাত্মার ধাতে সহিল না। তিনি শীঘ্রই অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইলেন, খরচ-পত্রের দিকেও সতর্ক হইয়া উঠিলেন; একটী পেনিও তিনি হিসাবের খাতায় না তুলিয়া ব্যয় করিতেন না। ব্যারিষ্টার হইতে হইলে গ্র্যাজুয়েট না হইলেও চলে; কিন্তু মহাত্মা ইংরাজীতে খুবই কাঁচা ছিলেন; রাজকোটের পলিটিকেল এজেণ্ট মিঃ লেলির মুখে শুনিয়াছিলেন—"Graduate first, then come to me" "আগে গ্র্যাজুয়েট হও, তার পর আমার কাছে এস।" মহাত্মা লণ্ডনের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি খাদ্যসমস্যা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; দুগ্ধ, ক্ষীর ও ডিম নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে গণ্য হওয়ায় তিনি কিছু দিন খাইয়াছিলেন; কিন্তু অল্প দিন পরেই রুটী, ফল, শাকশবজীই তিনি গ্রহণ করেন।

বিলাতে মহাত্মার মন ব্যয়-সঙ্কোচ, নিরামিষ খাদ্যের বিচার, স্বাস্থ্য-রক্ষার নীতি এই লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত; তিনি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মচর্চ্চার অবকাশ লাভ করেন নাই। বিলাতে নিরামিষ-ভোজীর এক সমিতি ছিল, মহাত্মা তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন।

বিলাতে এই সময়ে যাঁহারা অধ্যয়নার্থে ভারত হইতে সমাগত হইতেন, তাঁহারা অনেকেই অবিবাহিত; মহাত্মার অবস্থা অন্যরূপ ছিল; কিন্তু যে সকল মহিলারা মহাত্মার সহিত মিশিতেন, তাঁহারা ইহা জানিতেন না। মহাত্মার সহিত অবিবাহিত যুবতীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মূলে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকা সত্যের অপলাপ মনে করিয়া, ব্রাইটনে অবস্থান-কালে তিনি এই সত্যটা জ্ঞাপন করিতে তাঁর অভিভাবিকা এক মহিলাকে এইরূপ পত্র দিয়াছিলেন—"আপনি ব্রাইটনে মাতৃস্নেহে আমায় দেখিয়া থাকেন, হয় তো আমায় অবিবাহিত মনে করিয়া থাকিবেন, আমার বিবাহিত-জীবনের ব্যবস্থা করিতে তাই যুবতী মহিলাদের সহিত আলাপ করাইয়া দিতে আপনি প্রযত্ন করেন; কিন্তু এই স্নেহের আমি অধিকারী নহি,……আমি নির্ভীকভাবেই বলিতেছি, আমার বাল্যবিবাহ হইয়াছে; এতদিন ঐ কথা না বলায় যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দুঃখিত। এই অবস্থা জানিয়াও যদি আপনারা স্নেহ প্রদর্শন করেন, তবে আমি কৃতার্থ হইব, যদি আমায় পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেও আপনার স্নেহ চিরদিন স্মরণ রাখিব।"

এই পত্র পাইয়া ইংরাজ-মহিলাদের মনে তাঁহার বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার কৌতূহল জাগিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী সত্য গোপন করার জন্য এতদিন যেরূপ বিপন্ন মনে করিতেছিলেন, নিজের

প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। সত্যানুরাগের ইহা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !

মহাত্মা বিলাতে গিয়া গীতা পাঠ করেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি গীতা দেখেন নাই। স্যার এডউইন আরনল্ড সাহেবের অনুবাদ পড়িয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন, তাঁহার গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই কয়েকটী সূত্র বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এবং এই সঙ্কেত তাঁর জীবনকে ধর্ম্মপথে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥" ইত্যাদি।

এই সময়ে ব্লাভট্স্কির উদ্যোগে বিলাতে থিয়োসফিকেল সোসাইটী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল; তিনি এক বন্ধুর সহিত এইখানে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লাভট্স্কি ও মিসেস বেসাণ্টের সহিত পরিচয় স্থাপন করেন, তাঁহাকে এই সোসাইটীতে যোগদান করার অনুরোধ হইলে তিনি বলিলেন—"With my meagre knowledge of my religion, I do not want to belong to any religious body." "আমার নিজের ধর্ম্মে এত অল্প জ্ঞান থাকিতে অন্যের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদানের ইচ্ছা আমার নাই।" মহাত্মার ধর্ম্মবোধের উন্মেষ না থাকিলেও তিনি বুঝিতেন, তাঁর একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, সে ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ অবগত না হইয়া পরধর্ম্মে যোগ দেওয়া শ্রেয়ঃ হইবে না— এই বোধ পাশ্চাত্যজ্ঞানমুগ্ধ কয়জন তরুণের জন্মে, তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

কিন্তু তিনি ব্লাভট্স্কির "Key to Theosophy" পুস্তক পড়িয়াই হিন্দুধর্ম্মমূলক গ্রন্থরাজী পাঠে আগ্রহান্বিত হন। তিনি ইহা হইতেই

বুঝেন, যে হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাঁহার ধারণা অমূলক এবং ইহার জন্য তিনি অনুতপ্ত হন।

এই সময়ে তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করেন। রাজকোটে খৃষ্টান-সভ্যতার নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিলে, একজন খৃষ্টান মিশনারী বলেন, ধর্ম্মে মদ্য-মাংস ভোজন ব্যাপার লইয়া কোন কথা নাই; অনেক খৃষ্টান ইহা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি একজন নিরামিষভোজী। তাঁহার উপদেশে তিনি বাইবেল-পাঠে মনোযোগী হন। খৃষ্টের উপদেশাবলী তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। স্যার আরনল্ডের "Light of Asia" তিনি পড়িয়াছিলেন; বাইবেল ও গীতার সহিত ইহার আলোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইল—ত্যাগই সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কারলাইলের "Hero and Hero worship", ব্রাড্লফের নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন। মূল অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত থাকায় তিনি অধিক গ্রন্থপাঠে সুযোগ পান নাই, তবে এক সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠের আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল হইয়াছিল।

বিলাতে অবস্থান-কালে তাঁহাকে একটী ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পোর্ট্স্মাউথে নিরামিষভোজীদের এক সভার অনুষ্ঠান হয়। মহাত্মা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। একদিন কোন বন্ধুর সমভিব্যাহারে তিনি কয়েকজন মহিলার সহিত ব্রিজ খেলিতেছিলেন; রঙ্গরহস্যের মাত্রা নীতিকে অতিক্রম করিল; মহাত্মাও তাহাতে এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, যে হাতের তাস দূরে ফেলিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করায় উদ্যত হইলেন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে তাঁহার বন্ধুর মুখে বাহির হইল—

"Whence this devil in you, my boy! Be off, quick." 'এমন দুষ্টবুদ্ধি কোথা থেকে এলো, তুমি দূর হও, শীঘ্র বিদায় লও।" মহাত্মা তাই বলেন—"নির্ব্বল কো বল রাম", তাঁহার মনে হইল, ভগবানই সত্যরক্ষা করিলেন। সেইদিন তিনি অনুভব করিলেন, মানুষের সাধ্য যখন তুচ্ছ, তখন কোন অদৃশ্য জগৎ হইতে শক্তি আসিয়া তাহার ধর্ম্মরক্ষার সহায় হয়। পূজা, প্রার্থনা, উপাসনা মানুষের কুসংস্কার নয়; আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, উপবেশন বরং জীবনের গৌণ প্রয়োজন, কিন্তু জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ভগবানের আরাধনা; এই আরাধনা বাণী মাত্র নয়, মন্ত্রের উচ্চারণ নয়, সুগভীর হৃদয়ের গঙ্গোত্রীধারার প্লাবন। হৃদয় পবিত্র না হইলে উপাসনা হয় না, হৃদয় শূন্য হইলেই প্রেমলাভ হয়। মহাত্মার জীবন এই ঘটনায় আরও স্বচ্ছ সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

এইরূপে মহাত্মা কোন এক তৃতীয় হস্তের প্রসাদে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁর বিদায়-ভোজের সময়ে দাঁড়াইয়া দু'কথা বলিবার যোগ্যতাও তিনি তখনও অর্জ্জন করেন নাই; এই অবস্থায় তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন।

*

কর্ম্মক্ষেত্রে মহাত্মা

ভারতে আসিয়া আইন-ব্যবসায়ে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই—আইন-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহার প্রয়োগকৌশল শিখেন নাই। বোম্বাই প্রদেশে তখন স্যার ফিরোজসা মেটা,

বদ্রুদ্দিন প্রসিদ্ধ আইনজীবী। তিনি ভারতে ওকালতী করার পক্ষে নিজেকে নিতান্ত অনুপযোগী মনে করিলেন; দুইবার মকদ্দমা করিতে গিয়া দেখিলেন, ইহাতে তাঁহার সফলকাম হওয়া খুবই দুঃসাধ্য; অবশেষে পঁচাত্তর টাকা মাহিনায় স্কুল-মাষ্টারী করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। তিনি লণ্ডনের ম্যাট্রিক, লাটিনে পাশ, তবুও সে চাকুরী পাইলেন না; শেষে বোম্বাই ছাড়িয়া তিনি রাজকোটে দরখাস্ত লিখিয়া মাসিক ৩০০৲ টাকা উপায় করিতে আরম্ভ করিলেন। ওকালতি ব্যবসার যে ফন্দী, তাহা তিনি জানিতেন না; মকদ্দমা জুটাইয়া দিলে দালালকে মক্কেলের টাকার অংশ দিতে হয়, ইহা তাঁহার অসহনীয় বোধ হইল। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় "দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর" এক মকদ্দমায় মহাত্মা নিয়োগ-পত্র পাইলেন। এক বৎসরের জন্য এক শত পাঁচ পাউণ্ড ফীতে তিনি নেটাল যাত্রা করেন; তাঁর এইখানেই জন্ম-কর্ম্মের সকল সাফল্য সূচিত হইয়াছিল।

মহাত্মার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তাঁর আর একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি উপজীবিকার জন্য পুনরায় বিদেশ-যাত্রা করিলেন।

পোর্ট নেটালের অন্য নাম ডার্ব্বান। মহাত্মাকে লইয়া দাদা আবদুল্লা কোর্টে উপস্থিত হইলেন। এইখানে প্রথম সংঘর্ষ-সৃষ্টি। ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মার মাথা হইতে পাগ্ড়ী খুলিয়া ফেলার আদেশ দিলেন; তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কোর্ট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আবদুল্লা বুঝাইলেন, এখানে কোর্টে পাগড়ী পরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা নাই। মহাত্মা সে কথা কাণে লইলেন না; বরং দেখিলেন, ভারতীয়দের কুলী বলিয়াই খ্যাতি হইয়াছে, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, কেরাণী, ব্যবসায়ী, কৃষক, সকলেই শ্বেতাঙ্গগণের নিকট কুলী নামে অভিহিত। তিনি

ভারতীয় সম্মানবোধ রক্ষা করার জন্যও কোন কারণে মাথার পাগ্ড়ী নামাইতে প্রস্তুত হইলেন না। এখানে তাঁহার নাম কুলী-ব্যারিষ্টার হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করায় "unwelcome visitor" নামে তাঁর কথা ডার্ব্বান সহরে ছড়াইয়া পড়িল।

দাদা আবদুল্লার মোকদ্দমা ট্র্যান্সভালে হইতেছিল। এক সপ্তাহ পরে তিনি তাঁহাকে প্রিটোরিয়ায় যাইবার জন্য অনুযোগ করিলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর টিকিট কেনা হইল। বিছানার দরকার থাকিলে অধিকন্তু পাঁচ শিলিং দিতে হয়; মহাত্মা ইহা অনাবশ্যক মনে করিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। নেটালের রাজধানী মার্টিজ্বার্গ, রাত্রি ৯ ঘটিকায় গাড়ী তথায় উপস্থিত হইল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের এইস্থানে বিছানাপত্র সরবরাহ করা হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি পড়িল, মহাত্মাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করার আদেশ হইল। মহাত্মা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, ডার্ব্বান হইতে যথারীতি টিকিট কিনিয়াছেন, এই সকল যুক্তি কোন কাজের হইল না; মহাত্মাকে পুলিশের সাহায্যে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল। ইহার প্রতিকার নাই, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম গর্হিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল না। ভারতীয়গণ আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল; বলিল প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভারতীয়দের এই দুর্দ্দশা নূতন নয়, নিত্য হইয়া থাকে; মহাত্মাকে তাঁহারা নানা সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিল। মহাত্মা ভাবিলেন, এই অপমান সহ্য না করিয়া ভারতে ফিরিয়া যাইবেন; কিন্তু ভারতবাসীর উপর এই ঘৃণ্য আচরণের প্রতিকার-বাসনায় তাঁর প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বিছানার টিকিট খরিদ করিয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

অনশনে মহাত্মা

ভোরে চার্লসটাউনে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। তখনও জোহেনস্‌বার্গ পর্য্যন্ত রেল বিস্তার হয় নাই, অশ্ব-যানের ব্যবস্থা ছিল। মহাত্মাকে ভারতবাসী দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ পরিচালক তাঁহাকে লইতে চাহিল না। তিনি অনেক যুক্তির পর স্থান পাইলেন; কিন্তু যাত্রীদের গাড়ীর ভিতরে বসিবার কথা, সেখানে শ্বেতাঙ্গ যাত্রী থাকায় তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইল না, অশ্বচালকের পাশে যে বসিবার স্থান সেইখানে তাঁহাকে তুলিয়া লওয়া হইল। বিবাদ করিয়া লাভ নাই, মহাত্মা নীরবে এই অপমান মাথা পাতিয়া লইলেন। বিপদ্ বাধিল "পরদেকোপে" গাড়ী পৌছিলে। পরিচালক-পুঙ্গব এই সময় গাড়ীর বাহিরে আসিয়া কোচম্যানের পায়ের তলায় একখণ্ড কাগজ বিছাইয়া বলিল—"স্বামী নামিয়া বস, আমার একটু হাওয়ার দরকার হইয়াছে।" মহাত্মার অবস্থা অনুমেয়; তিনি ইহাতে রাজী হইলেন না। সে ব্যক্তি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া মহাত্মাকে জোর করিয়া নামাইবার উপক্রম করিল; ক্ষীণজীবী মহাত্মা গাড়ীর পিত্তলের ডাণ্ডা ধরিয়া রহিলেন। সে তখন নিরুপায় হইয়া প্রচণ্ড চড়-মুষ্টিপ্রহারে মহাত্মাকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। আরোহিগণ করুণস্বরে বলিল—"man, let him alone, don't beat him"; তখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কোচম্যানের অপর পাশে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, তাহাকে উঠাইয়া মহাত্মাকে সেইখানে বসিতে দিল, আর আঙ্গুল নাড়িয়া বলিল—"আচ্ছা, ষ্ট্যান্‌ডার্টনে পৌছাই, কি করি দেখাব!" নিঃসহায় লাঞ্ছিত মহাত্মা নীরবে ভগবানের কাছে দুঃখ নিবেদন করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ষ্ট্যানডার্টনে পৌছিতে রাত্রি হইল। পুনর্নির্য্যাতনের আশঙ্কায় তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। ডার্ব্বান হইতে আবদুল্লা মহাত্মার আগমন-

বার্ত্তা তারযোগে এই স্থানের অধিবাসীদের জানাইয়া দিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার অভ্যর্থনায় কয়েকজন ভারতবাসীকে ষ্ট্যানডার্টনে সমাগত দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। মহাত্মা সকলকে তাঁর বিপদের কথা বলিলেন; তাহারা দুঃখপ্রকাশ করিল মাত্র, এইরূপ অপমান তাহাদের নিত্য ঘটিয়া থাকে। কোচ-কোম্পানীর এজেণ্টকে তিনি সমস্ত খবর জানাইলেন, উত্তর পাইলেন, "ষ্ট্যানডার্টন হইতে বড় গাড়ীর ব্যবস্থা আছে, উক্ত পরিচালক উহাতে থাকিবে না, অন্যান্য আরোহীর সঙ্গে আপনার স্থান হইবে।" চমৎকার!

জোহেন্সবার্গে পৌছিয়া তিনি কোন হোটেলে আশ্রয় পাইলেন না; ভারতবাসীকে কোন শ্বেতাঙ্গের হোটেলে স্থান দেওয়া হয় না। প্রিটোরিয়া জোহেন্সবার্গ হইতে সাঁইত্রিশ মাইল। তিনি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন; জোহেন্সবার্গের ভারতীয় বন্ধুরা নিষেধ করিল। তিনি রেলওয়ের টাইম-টেবিলে ভারতীয়দের প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা তেমন স্পষ্টভাবে লেখা নাই দেখিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন। পথে গার্ড-সাহেব তাঁহাকে গাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছিল; একজন ইংরাজ-যাত্রী ইহাতে আপত্তি করায়, কুলীর সহিত এই শ্বেতাঙ্গের একত্র থাকিতে আপত্তি নাই দেখিয়া সে আর কোন কথা বলে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি কি অকথ্য অত্যাচার হয়, তাহা ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন।

নেটালে দাদা আবদুল্লার ন্যায় শেঠ তায়েব হাজিখান মোহম্মদ প্রিটোরিয়ায় যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি প্রতিপত্তিশালী। মহাত্মা তাঁহার নিকট হইতে ট্র্যান্সভালে ভারতীয়দের অবস্থার পরিচয় লইলেন।

তিনি ভারতীয়দের লইয়া সভাসমিতির আয়োজন করিলেন। ইংরাজী-জানা লোক একপ্রকার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তিনি ইংরাজী শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনজন শিক্ষার্থী জুটিল—তুই জন মুসলমান ও একজন হিন্দু। বৃটিশ এজেণ্টের নিকট তিনি ভারতীয়দের তুর্গতির কথা জ্ঞাপন করিলেন। বৃটিশ এজেণ্ট মিঃ জাকুবাস দে ওয়েষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, ইহা ছাড়া আর কিছু করার শক্তি তাঁহার ছিল না। তিনি অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেট্ হইতে ভারতীয়দের তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থার কথা জানাইলেন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তিনি জবাব পাইলেন, ভারতীয়েরা যদি উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে বাধা নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই মহাত্মা ট্র্যান্সভালের ভারতীয় অধিবাসীদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। তিনি যে কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাহা শেষ হইলেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; অতএব এই সকল বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন বৃথা—কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা মহাত্মার কর্ম্মযজ্ঞ এই একান্ত প্রতিকূল ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হওয়ার যে বিধান করিয়াছেন, তাহা তিনি তখন জানিতে পারেন নাই।

দাদা আবতুল্লার এটর্ণী মিঃ বেকারের সহিত মহাত্মার আলাপ করিতে হইয়াছিল। তিনি খৃষ্টান মিশনারীও ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি মিঃ কোট্সের সহিত পরিচিত হন। ট্র্যান্সভালে তখন ভারতীয়দের উপর কঠিন আইন জারী হইয়াছিল, অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেটে কোন ভারতীয়কে ব্যবসা বা জমি লইয়া আবাদ করিতে দেওয়া হইত না। ট্র্যান্সভালেও ভারতীয়দের প্রবেশ করিতে হইলে তিন পাউণ্ড ট্যাক্স দেওয়ার আইন

প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; অধিকন্তু কোন ভারতীয়ের ফুটপাথের উপর দিয়া চলার অধিকার ছিল না, রাত্রি নয় ঘটিকার পর পথে বাহির হওয়াও নিবারণ করা হইয়াছিল। ভারতে অস্পৃশ্যজাতির প্রতি বৃটিশের মমতা দেখিয়া মনে হয়, ট্র্যান্সভালে ভারতীয়দের প্রতি এই ঘৃণ্য আচরণ তাঁহারা দীর্ঘদিন কেমন করিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন!

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি মহাত্মার স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। তিনি রাত্রি নয়টার পর ফুটপাথের উপর দিয়াই ভ্রমণ করিতেন। একদিন পুলিশের পদাঘাত খাইয়া তিনি বুঝিলেন, সত্যই এদেশে ভারতবাসীর দুঃখের অবধি নাই। ভগবানের রাজ্যে মানুষের উপর এই অত্যাচার তাঁর মর্ম্মে ধীরে ধীরে আঘাত দিতে লাগিল। তখনও তিনি ভাবিতেছেন, এক বৎসর পরে ভারতে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি অভিজ্ঞতাই অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই এক বৎসরে তাঁর হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইল। আইনজীবির যে সকল তথ্য জানা দরকার, দাদা আবদুল্লার মকদ্দমার তদ্বির করার কাজে নিযুক্ত হওয়ায় তাহা আয়ত্ত হইল। তিনি ভারতবাসীর সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করার প্রয়োজন বুঝিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ লিওনার্ড দাদা আবদুল্লার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মকদ্দমায় আবদুল্লার জয় অনিবার্য্য ছিল; কিন্তু আইনের চালে প্রতিপক্ষ বিষয়টী এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, যে তাহা সহজে সিদ্ধান্ত হওয়ার উপায় ছিল না। মহাত্মা এই মকদ্দমা শেষে সালিশী দ্বারা নিষ্পত্তি করায় উভয় পক্ষই তাঁর অনুরাগী হইয়া পড়িল।

তিনি ভারতপ্রত্যাগমনের জন্য ডার্ব্বানে পৌছিলেন; তাঁহাকে বিদায় দিবার আয়োজন হইল। অকস্মাৎ সংবাদপত্রের এক কোণে তিনি

দেখিলেন—"Indian franchise", তাহা পড়িয়া অবগত হইলেন, যে নেটালের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার অধিকার হইতে ভারতীয়দের বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হইতেছে। দাদা আবদুল্লাকে এই সকল তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে ভারতীয়দের আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার এই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত দাঁড়াইয়া আত্মদানের প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার সভায় ট্র্যান্সভালে দীর্ঘদিন তাঁহার থাকার সূচনাই হইল—ভারতীয়দের মধ্যে এক অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখা দিল। মহাত্মার কর্ম্মজীবনের এইখানেই সূত্রপাত। তাঁহার খরচপত্রের জন্য টাকার কথা উঠিলে, তিনি বলিলেন, সাধারণের সেবাকার্য্যে টাকা লইতে নাই; তবে ভারতীয়দের অধিকার বজায় করার জন্য যে ব্যয়, তাহা ভারতীয়দের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রেরণায় ট্র্যান্সভালবাসী ভারতীয়দের প্রাণে নব প্রাণ সঞ্চারিত হইল।

ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইস বিলের কাজ এক দফা শেষ হইয়াছে; ইহার দ্বিতীয় দফা আলোচনা হইতেছিল। মহাত্মার আহ্বানে ট্র্যান্সভাল-বাসী ভারতীয়গণ মহতী সভায় যোগদান করিল। তরুণ ভারতীয় খৃষ্টানগণও মহাত্মার কাজে উৎসাহিত হইল। তাহারা এতদিন শ্বেতাঙ্গদিগের মুখ চাহিয়া করুণাপ্রার্থী ছিল, মহাত্মা বলিলেন—ধর্ম্মান্তর হওয়ায় ভারতের মর্য্যাদারক্ষায় কেন তাহারা উদাসীন থাকিবে! মিঃ পল আদালতে দোভাষীর কাজ করিতেন, মিঃ গডফ্রে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই দুই জনের সহায়তায় দলে দলে ভারতীয় খৃষ্টানগণ এই আন্দোলনে যোগ দিল। স্বেচ্ছাসেবকদল গড়িয়া উঠিল। লর্ড রিপন তখন ঔপনিবেশিক

মন্ত্রী; দশ হাজার ট্র্যান্সভালবাসীর স্বাক্ষরিত ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইস বিলের প্রতিবাদ-পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইলে, জগতে মহাত্মার এই উদ্যোগের কথা ছড়াইয়া পড়িল। 'টাইমস্-অফ ইণ্ডিয়াতে' ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইল। মহাত্মার জীবন-যজ্ঞের অনলশিখা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মহাত্মা বুঝিলেন—এই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর দুর্গতি মোচন করিতে হইলে, এইখানেই তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে। একজন ব্যারিষ্টারের মত সসম্মানে বাস করিতে হইলে, ন্যূনকল্পে এক বৎসরে তিনশত পাউণ্ড না হইলে চলিবে না। দাদা আবদুল্লা প্রমুখ নেটালের অধিবাসিগণ এই অর্থ ভারতীয়দের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিলেন। মহাত্মার ইহা মনঃপুত হইল না; তিনি দেশ ও দশের সেবায় এইরূপ অর্থে জীবনধারণ শ্রেয়ঃ মনে করিলেন না, নেটালে ব্যারিষ্টারী করার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি নির্য্যাতিতের পরম সুহৃদ্‌রূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসন বিছাইয়া বসিলেন। নবযুগের আরম্ভ হইল। হিন্দু, মুসলমান, পারসিক, খৃষ্টান, ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর কণ্ঠে তুমুল গর্জ্জন উঠিল—"গান্ধীজী কী জয়!"

মহাত্মা নেটাল প্রদেশে ব্যারিষ্টারী করার দরখাস্ত করিলেন। শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারজীবিগণের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল; কিন্তু নেটালের সুপ্রীম কোর্টে তাহাদের প্রতিবাদ টিকিল না। বিচারপতি অতঃপর তাঁহাকে আদালতে পাগড়ী পরিয়া উপস্থিত হইতে নিষেধ করিলেন; মহাত্মা তাহা অস্বীকার করিলেন না। তাঁর জীবনে এই প্রথম অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। তাঁহার অনুরাগী বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট

হইলেন, ইহা ভীরুতার পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মহাত্মার নিন্দা করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—জিদ্‌বশে এই সামান্য বিষয় লইয়া নেটাল গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রাম করা শক্তিক্ষয় মাত্র, ইহাপেক্ষা তাঁহাকে ভীষণতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন—"When at Rome, do as the Romans do"—"রোমরাজ্যে রোমেরন্যায় থাকিতে হইবে।" ভারতে যদি ভারতীয় পরিচ্ছদ আদালতে নিষিদ্ধ হয়, তিনি তাহা অস্বীকার করিবেন, নেটাল প্রদেশে ইহা অমান্য করিবেন না। তাঁর এই যুক্তি অনেককে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই ; কিন্তু নেটালের আইন-সঙ্ঘ তাঁর ব্যারিষ্টারী করার পথে অন্তরায় হওয়ায়, মহাত্মার নাম অধিক করিয়া সুপ্রচারিত হইল। তিনি অর্থাদি ব্যাপারে যেমন হিসাবী মানুষ, নিজের সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সেইরূপ অমোঘ অব্যর্থ দৃষ্টি লইয়া পা বাড়াইতে কোন দিন ভুল করেন নাই। মাথার পাগড়ীর জিদ্ ছাড়িয়া তিনি এমন ক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইলেন, যে নেটালের আকাশ বাতাস আবার তাঁর জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তিনি ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইস আন্দোলনের পক্ষে বিলাতে আবেদনপত্র পাঠাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন না—নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস-সভা গড়িয়া তুলিলেন। আইন ব্যবসা নামে মাত্র রহিল, তিনি কংগ্রেসের কাজে প্রায় সবখানি শক্তিই নিয়োজিত করিলেন। বলসুন্দরমের ঘটনায় তাঁর নাম ভারতে আসিয়া পৌঁছিল ; ভারতীয় কুলীর প্রতি শ্বেতাঙ্গবর্গের অত্যাচারের প্রতিকার-কল্পে তিনি প্রাণপণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চুক্তিবদ্ধ দাসবৃত্তিপরায়ণ ভারতের নারী পুরুষ তাঁহার নিকটে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল ; তিনি এই

প্রথা দূর করিতে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ইহার উপর ভারতীয় মাথা প্রতি তিন পাউণ্ড কর ধার্য্য হওয়ার ব্যবস্থা হইলে, তিনি কংগ্রেসের সাহায্যে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। নেটালে পূর্ব্বে জুলুদের দ্বারা আবাদ চলিত; তাহা সুবিধামত না হওয়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্ত্ত করিয়া নেটাল গভর্ণমেণ্ট ভারত হইতে শ্রমিক সংগ্রহ করে। পাঁচ বৎসরের জন্য এই সকল শ্রমিকদের চুক্তি করিয়া লওয়া হইত। তাহার পর স্বাধীনভাবে নেটাল প্রদেশে তাহাদের চাষ আবাদ করার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষীয় শ্রমিকদের অধ্যবসায় ও যত্নে তাহারা অতি শীঘ্র নেটালে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, তাহারা আর কুলী রহিল না— বড় বড় ব্যবসাদার হইয়া উঠিল। ইহাতে নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায়, তাহারা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একরূপ চুক্তি-করা শ্রমিকের মাথা প্রতি পঁচিশ পাউণ্ড কর ধার্য্য করে। মহাত্মার আন্দোলনে শেষে ইহা কমাইয়া তিন পাউণ্ড কর ধার্য্য হয়। কিন্তু ইহাও ভারতীয়দের প্রতি অবিচার। ইহা লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মার কীর্ত্তির কথা বর্ণনার বিষয় নহে। ভারতবাসীর স্বার্থ-সংরক্ষণে তিনি নিজের সবখানি শক্তি প্রয়োগ করেন। দশহাজার ভারতবাসী কারাবরণ করে। অনেকে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বলি দেয়। জেনারল স্মাট্‌স্‌ সে দিন ভারতবাসীর দাবী উপেক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যের দাবী শেষে পূর্ণ হইয়াছিল। ভারতবাসীর উপর এই অবিচার আজ আর নাই।

মহাত্মা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে প্রচার করিয়াছিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে তখন মহামতি রাণাড়ে, ফিরোজ শা মেটা, ওয়াচা প্রভৃতি নেতৃবর্গের প্রতিভা ও প্রতিপত্তিতে ভারতবর্ষ গৌরবময়; বাংলার সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, মতিলালের খ্যাতি ও যশঃসূর্য্য তখন মধ্যাহ্নগগনে; মহারাষ্ট্রে তিলক ও গোখ্‌লের অগ্নিবর্ষী বাণী ভারতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে; মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত জি পরমেশ্বরান পিলাই, সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভারতের গৌরব-যুগের স্বপ্নে জাতিকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। তিনি এই নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, সর্ব্বত্র সভাসমিতি করিয়া নেটালের ভারতবাসীর দুঃখের কথা জানাইলেন। স্যার ফিরোজ শা মেটা মহাত্মার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন; কিন্তু তাঁর হিমালয়ের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যক্তিত্বের সহিত মহাত্মার নিবিড় পরিচয় সম্ভব হইল না। তিলকের অতলস্পর্শী জলধি-তল চরিত্রের গভীরতায় তিনি বিমূঢ় হইলেন; কিন্তু গোখ্‌লের স্নেহশীতল গঙ্গোত্রীধারায় অভিষিক্ত হইয়া তিনি ধন্য হইলেন। চিরদিন মহাত্মা রাষ্ট্র-জগতে গোখ্‌লেকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করেন।

নেটালবাসীর তার পাইয়া মহাত্মাকে শীঘ্রই পুনরায় ডার্ব্বানে ফিরিতে হইল। এইবার তিনি সপরিবারে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নেটালে অবস্থানকালে তাঁর কার্য্যকলাপে এবং ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা আন্দোলনে নেটালের শ্বেতাঙ্গ-সমাজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। করাণ্টাইন আইনের দ্বারা তিনি যাহাতে ডার্ব্বানে অবতরণ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যখন তিনি তীরে অবতরণ করার আদেশ পাইলেন, তখন বিপদ্‌ ঘনীভূত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ-সমাজের অভিযোগ, যে তিনি ভারতে অবস্থান-কালে নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অকথ্য নিন্দা প্রচার

করিয়াছেন এবং নেটাল দেশ ভারতবাসীর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে দুই জাহাজ ভারতীয় কুলী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহাত্মার কাণে এই সংবাদ পৌছিল, যে তিনি যদি ডার্ব্বানে দিবাভাগে অবতরণ করেন, তবে তাঁহাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া হত্যা করা হইবে; কিন্তু মিঃ লগ্‌টন্ সাহেব আসিয়া সাহস দিলেন। গান্ধীজীর পত্নী ও পুত্র কন্যাগণকে স্বতন্ত্র ভাবে নেটালের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রোস্তমজীর বাড়ী পাঠাইয়া, গান্ধীর সহিত ইনি পদব্রজে ডার্ব্বানের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর রক্ষা রহিল না—মিঃ লগটন্ সাহেবকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া উদ্ধত জনসঙ্ঘ মহাত্মাকে আক্রমণ করিল, নির্ম্মম প্রহারে তিনি জর্জ্জরিত হইলেন। এই সময়ে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নী শ্রীমতী এলেক্সাণ্ডার দৈবক্রমে এই স্থানে উপস্থিত না হইলে, মহাত্মা প্রাণে বাঁচিতেন না। শ্বেতাঙ্গ জনতার কণ্ঠে উচ্চ রোল উঠিয়াছে—

"Hang old Gandhi
On the same apple tree."

সে যাত্রা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলেক্সাণ্ডর তাঁহাকে ছদ্মবেশে রোস্তমজীর বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড় থামিলে, ঔপনিবেশিক মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলিনের নিকট এই ঘটনার কথা গিয়া পৌছিল; তিনি অপরাধীদের দণ্ড-বিধানের দাবী জ্ঞাপন করেন। মহাত্মাকে অপরাধীদের সনাক্ত করিতে বলা হইলে, তিনি বলিলেন, "যাহারা আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহারাই ইহার জন্য দায়ী নহে; রয়টারের সংবাদে তাহাদের বুঝান হইয়াছে, যে আমি নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচার করিয়াছি এবং

ভারত হইতে নেটাল প্রদেশ ভরাইয়া দিবার জন্য ভারতবাসী আনিয়াছি; তাহারা যখনবুঝিবে, এই দুইটী সংবাদই মিথ্যা, তখনই তাহারা তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে।"

মহাত্মার এই উক্তি নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিবর্গকে যুগপৎ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে স্তম্ভিত করিয়াছিল। মহাত্মা অত্যাচার সহিতে যেমন অসহিষ্ণু নহেন, অত্যাচারীর উপর কোন উপায়ে প্রতিশোধ লওয়াতেও তেমনই ধৈর্য্যহীন হন না, স্থিরভাবে জগতের অশুদ্ধি বহন করিতেই যেন তাঁর জন্ম হইয়াছে—নেটাল বন্দরের এই ঘটনায় তাহাই সুপ্রমাণিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সপরিবারে ডার্ব্বান আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন-যাপনের রীতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অতীব কৌতুকপূর্ণ উঠিয়াছিল। স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় তিনি নিজের পরিচ্ছদাদি নিজের হাতেই কাচিয়া লইতেন, ইহা শোভন হইত না। একবার প্রিটোরিয়ায় কোন শ্বেতাঙ্গ নাপিত তাঁহার চুল কাটিতে চাহে নাই, এই ঘটনা হইতে মহাত্মা নিজেই নাপিতের কাজ সারিয়া লইতেন। বন্ধুগণ পরিহাস করিয়া বলিতেন—"...Rats have been at it", তিনি এই সকল বিদ্রূপ আমোলে আনিতেন না। পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজী শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তিনি নিজের বাড়ীতেই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; পত্নীর পুত্র-সম্ভাবনা হইলে ধাত্রীর কাজও স্বয়ং সম্পাদন করেন। সেবাধর্ম্মে তাঁর নিরতিশয় অনুরাগ ছিল। বুথ সাহেবের সাহচর্য্যে তিনি হাঁসপাতালে রোগীর শুশ্রূষা করিলেন। কুষ্ঠের সেবায় তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন; ক্ষত ধৌত করা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া, স্ব-গৃহে আশ্রয় দেওয়ায় বাধিত না।

জুলু বিদ্রোহে ও ট্র্যান্সভাল-যুদ্ধে তিনি সেবা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এগার শত স্বেচ্ছাসেবক ও চল্লিশ জন অধ্যক্ষ এবং ডাক্তার বূথকে লইয়া এই সেনাবাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধকালে অগ্নিক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের কুড়াইয়া আনার কার্য্যে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

নেটালে কয়েক বৎসর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গান্ধী ভারতে প্রত্যাগমন করেন। নেটালবাসী এই সময়ে তাঁহাকে সাড়ম্বরে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করে। হীরকখচিত এক ছড়া হার তিনি উপহার পাইয়াছিলেন। তাহা গ্রহণ করার অধিকার তাঁহার আছে কিনা, ইহা লইয়া তাঁর মন চঞ্চল হইয়া উঠে। পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহা ফিরাইয়া দেওয়ার কথাই স্থির হয়। শ্রীমতী গান্ধী নারীসুলভ স্বভাববশতঃ প্রথমে ইহাতে রাজী হন নাই; কিন্তু স্বামীর আদেশ তিনি লঙ্ঘন করেন নাই। দেশসেবার প্রতিদান গ্রহণে তাঁর বিবেকবুদ্ধি চিরদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তিনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মযোগী—এই চরিত্র গোড়া হইতেই তাঁর কার্য্যাদিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার কংগ্রেসে তিনি কেরাণীর কার্য্য করেন, পায়খানা পরিস্কার করা ও বেহারার কার্য্যে নিযুক্ত হন। কলিকাতার কংগ্রেসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তাব সম্বন্ধে পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দিনশা ওয়াচা সে বারে কলিকাতার কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

লর্ড কর্জ্জনের দরবারে রাজা মহারাজাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ভঙ্গী দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। গোখলের সমভিব্যাহারে তিনি ইঁহাদের সহিত যখন আলাপ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের ধুতি, সার্ট

প্রভৃতি ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদে সুন্দর বেশ দেখিয়াছেন; দরবারে খানসামাদের ন্যায় ইজার চাপ্‌কান পরিহিত দেখিয়া তাঁহাদের একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন—"Do you see any difference between Khansamas and us?" "আমাদের সহিত খানসামাদের প্রভেদ্‌ কিছু দেখিতেছ কি? "They are our Khansamas, we are Lord Curzon's Khansamas" মহাত্মা লর্ড হার্ডিঞ্জের দিল্লীর দরবারেই ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নারী-সুলভ বেশভূষা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি এক মাস ভারতনেতা গোখলের সঙ্গে থাকিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বর্গীয় কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর আলাপ হয়। ইঁহার মতে, হিন্দুধর্ম্মে পাপের ক্ষমা নাই। মহাত্মা ভাগবত গীতার ভক্তিমার্গের কথা উত্থাপন করেন; কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। মহাত্মাও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া উপকৃত হন নাই; তবে তিনি কালীঘাট পরিদর্শন করার জন্য মহাত্মাকে অনুরোধ করেন। মহাত্মা সেখানে ছাগবলির দৃশ্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হন। তিনি সর্ব্বত্র তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিয়া ইহার উন্নতিকল্পে অনেক প্রয়াস করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যাত্রীদের কোন অসুবিধার প্রতিকার হয় নাই। এক সময়ে তিনি ভারতের তীর্থে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, নানা কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া জ্ঞানপাপী-কুণ্ডে এক পয়সা দক্ষিণা দিলে, পাণ্ডা তাঁহাকে ইহার জন্য নরকভোগের অভিশাপ প্রদান করে!

তিনি পুনরায় বোম্বাই প্রদেশে ব্যারিষ্টারী করার ব্যবস্থা করেন।

এই সময়ে তাঁর পুত্র মণিলাল সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হয়। ডাক্তার মুরগীর যুষ দেওয়ার কথা তুলিলে, মহাত্মা তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি স্বয়ং পুত্রের চিকিৎসা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করেন। জল ও মৃত্তিকার চিকিৎসায় তাঁর বিশ্বাস এই ঘটনায় দৃঢ় হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কীর্ত্তির কথা ভারতে সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিল; এইবার তাঁর আইনব্যবসা ভাল ভাবেই চলার আশা ছিল। কিন্তু তখনও বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অবশেষ ছিল। হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তার আসিল—"Chamberline expected here, please return immediately." তিনি পুত্র-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার দক্ষিণ আফ্রিকার পথে ধাবিত হইলেন। এইবার চরম পরীক্ষাকাল তাঁর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে তিনি কয়েকজন তরুণকে সঙ্গে লইলেন; ইহাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য।

মিঃ চেম্বারলিন পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড পাওয়ার প্রত্যাশায় দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন, ভারতবাসীদের দুঃখের প্রতিকার করিতে নয়; শ্বেতাঙ্গ জাতি ও যুবকদের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা না করিলে ইহা হইবে না। মহাত্মা এই অবস্থায় ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ডেপুটেশনের ফল কি হইবে, সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত ছিলেন। মিঃ চেম্বারলিন ডেপুটেশনের উত্তরে বলিলেন—"ভারতবাসীর দুঃখ কষ্টের কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তিত ঔপনিবেশিক রাজ্যে বৃটেনের কিছু করিবার অধিকার নাই। তবুও যথাসাধ্য করিব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বাস করিতে হইলে, শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের খুসী করা চাই।" মহাত্মা স্তম্ভিত হইলেন। তারপর

অনশনে মহাত্মা

মিঃ চেম্বারলিন ট্র্যান্সভালে পৌঁছিলে প্রিটোরিয়ায় তিনি উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ডেপুটেশনে গান্ধীর নাম দেখিয়া কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিরক্ত হইলেন। ট্র্যান্সভালে তাঁহাকে প্রবেশের অধিকার দেওয়াই ভুল হইয়াছে, এই কথা জানাইয়া গান্ধীকে চেম্বারলিনের সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল না। ট্র্যান্সভালের অধিবাসীরা নিরাশ হইয়া বলিল—'আপনার কথাতেই আমরা যুবকবৃন্দের সেবকবাহিনী গড়িয়াছিলাম, এখন তার ফলভোগ হইতেছে।' মহাত্মা ইহার উত্তরে বলিলেন—'আহত সৈনিকের সেবাকার্য্য কর্ত্তব্যের সঙ্কেতেই করা হইয়াছে; তাহার প্রতিদানপ্রার্থী আমরা হইব না। তবে ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা মিঃ চেম্বারলিনের কাছে নিবেদন করিতে না পারিলে, ইংলণ্ড ও ভারতের লোক ভাবিবে, ট্র্যান্সভালের ভারতীয় অধিবাসীদের অভিযোগ করার কিছু নাই।' তিনি মিঃ গড্‌ফ্রে নামক একজন ভারতীয় ব্যারিষ্টারকে এই কার্য্যে অগ্রণী করিলেন। মহাত্মাকে মিঃ চেম্বারলিনের সহিত ডেপুটেশন লইয়া সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়ার কথায়, তিনি উত্তর দিলেন—'একই প্রতিনিধির কথা বার বার শোনার চেয়ে নূতন প্রতিনিধির কথা শুনা ভাল নয় কি!' অতঃপর তিনি ভারতীয় অধিবাসীদের অভিযোগাদির প্রতীকার যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, এই বলিয়া বিদায় দিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের প্রতি এইরূপ উপেক্ষা নীরবে সহ্য করিবার পাত্র নহেন। তিনি ট্র্যান্সভালের অধিবাসী নহেন, এই কারণে ট্র্যান্সভালের ভারতীয়দের পক্ষে ডেপুটেশন লইয়া মিঃ চেম্বারলিনের সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি ট্র্যান্সভালের সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া প্রিটোরিয়া

ও জোহেন্সবার্গে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিলেন। মহাত্মার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের কাল আসন্ন হইল।

ট্র্যান্সভালে বাটীর প্রবেশপথ রুদ্ধ করার কঠোর নিয়ম ছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ অনেক সময়ে অন্যায় করিয়া প্রায় একশত পাউণ্ড আদায় করিত; এই অভিযোগ তাঁহার নিকট উপর্য্যুপরি আসিতে লাগিল। তিনি ইহার প্রতিকারপরায়ণ হইলেন, সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ করিয়া আদালতে বিচারপ্রার্থী হইলেন। যে দুইজন কর্ম্মচারীর উপর তিনি অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন শাস্তিলাভের আশঙ্কায় পলাতক আসামী হইল; অন্যজনকে পুলিশ ধৃত করিল। কিন্তু জুরিদের বিচারে, তাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইল। মহাত্মা গান্ধীর উপর লোকেদের আস্থা আর রহিল না, চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ অত্যাচারের কথা তাঁহার কাণে আসিতেছিল; তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, ইহার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে না পারিলে ট্র্যান্সভালে অবস্থান করা নিরর্থক হয়।

এই সময়ে জোহেন্সবার্গে মহামারী প্লেগ আসিয়া দেখা দিল। শ্রমিকদের বাসস্থান একান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল, কালের চক্রে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার হইতে লাগিল। গান্ধী এই সময়ে নির্ভয়ে প্লেগ-রোগীর সেবায় ও চিকিৎসায় দিবারাত্রি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক ইউরোপীয়ান বন্ধু তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন—মিঃ ওয়েষ্ট, মিঃ পোলাক ইঁহাদের অন্যতম। কর্ত্তৃপক্ষগণ প্লেগ দমন করিতে অসমর্থ হওয়ায় মহাত্মা গান্ধীকে সাধারণের সাহায্যে ইহার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছিল। অবশেষে প্লেগাক্রান্ত

বস্তি এবং পল্লী অগ্নিসাৎ করার ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে শ্রমিক পরিবারবর্গের দুঃখের অবধি রহিল না। সহরের দূরে এক প্রান্তরে তাহাদের তাঁবু গাড়িয়া আশ্রয় লইতে হয়। মহাত্মার কাছে ৬০ হাজার পাউণ্ড তাহারা জমা দিয়াছিল; মহাত্মার প্রতি খৃষ্টান, মুসলমান, চীন, ভারতবাসীর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ইহা পরিচয়।

তিনি "ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন" নামে এক ইংরাজী কাগজ বাহির করেন; দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগাদির কথা ইহাতে বিবৃত হইত। এতদিন ইহা ডার্ব্বান হইতেই বাহির করার ব্যবস্থা ছিল, তিনি এইবার এই সংবাদপত্র পরিচালনার কার্য্যে এক নূতন ক্ষেত্র গঠনের প্রয়াসী হইলেন; সহরের পরিবর্ত্তে কোন গ্রামেই সংস্থান-গঠনে উদ্যোগী হইলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফিনিক্স নামক স্থানে তিনি সহকর্ম্মীদের লইয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। এই ফিনিক্সের নূতন সংস্থানই মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের বিদ্যুদ্বীর্য্য হইয়াছিল। এইখানে তিনি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বহু জাতির সহিত একত্র আহার বিহার, অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁর খাদ্য বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা এই আশ্রমজীবনেই আরম্ভ হয়। জন্মনিরোধসমস্যা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, তিনি কোন ব্যবহারিক উপায়ে ইহা করার অপেক্ষা আত্মসংযম-গুণে সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যসাধনায় অগ্রসর হইলেন। রাস্কিনের গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া,তিনি নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করিলেন। কর্ম্ম-তৎপরতায়, দৈন্য-ভোগের তপস্যায় তিনি নিজেও গড়িয়া উঠিলেন, তাঁহার সহকর্ম্মীদেরও সেইভাবে গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা সপরিবারে

এই ফিনিক্সের আশ্রমে ভবিষ্য জীবনসংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন; সে মহাযজ্ঞসাধনে দ্রুত ইন্ধন যোগাইতে বিধাতাও কৃপণ হন নাই।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত তিন পাউণ্ড মাথা প্রতি ট্যাক্স লইয়া এশিয়াবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করার আইন প্রবর্ত্তিত হয়। মহাত্মা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন; এই আন্দোলনের অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ। ভারতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, এসিয়া দেশের সর্ব্বজাতি, এমন কি আফ্রিকার নিগ্রোরা পর্য্যন্ত মহাত্মার ধর্ম্ম-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। মহাত্মাকে বার বার কারাগৃহে বন্দী করা হয়। সহস্র সহস্র লোকের বন্দীশালায় স্থান সংকুলান না হওয়ায়, তাহাদিগকে গভীর খনির গর্ত্তে আটকাইয়া রাখা হয়—সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহে উদ্বুদ্ধ নরনারী অকাতরে প্রাণবলি দিতে প্রস্তুত হয়। ভারতে এই সংবাদ পৌছিলে মহামতি গোখ্‌লে এই আন্দোলনের স্বপক্ষে তীব্র মতবাদ প্রকাশ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ভারতের কর্ণধার; বিচলিত হইয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদ করেন। জেনারল স্মাট্‌স কিছুতেই সে আইন মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদে উঠাইয়া লইবেন না, বলিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীর প্রায় সকল সর্ত্তে সম্মত হইয়া তিনি এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের যবনিকাপাত করেন। মহাত্মার জীবন-যুদ্ধের এই কুড়ি বৎসর কাল তাঁর অস্থি-মজ্জায় যে তেজোঃবীর্য্য, তপঃশক্তি সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা লইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে জন্য মহাত্মার জন্ম ও কর্ম্ম তাহার

প্রথমাংশের এই প্রস্তুতির সাধনা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালেই শেষ হইল; মোহনদাস করমচাঁদ জীবনসাধনায় সিদ্ধ হইয়া মহাত্মা গান্ধী-রূপে ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর আজ পর্য্যন্ত তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নাই; তবে ভারতের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শ তিনি কি ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে অসাধারণ তপস্যানিরত, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

* *
*

রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইউরোপে তখন কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। বাংলায় স্বদেশী যুগের উপলক্ষে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, বঙ্গভঙ্গ-রোধ হওয়ায় সে আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই। বাংলার তরুণ অগ্নিহোতৃদের দমন-কল্পে ভারত-রক্ষা-আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুরাটের দক্ষ-যজ্ঞের পর, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চরমপন্থী মধ্যপন্থীগণের মিলন-সভা-রূপে তখনও পরিগণিত হয় নাই—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের কংগ্রেসে ইহার সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন; বিবি বাসন্তী ও মাদ্রাজের ঋষিকল্প মহাপুরুষ সুব্রহ্মণ্য আয়ার কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবার জাতীয় ঋক্ উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিবি বাসন্তী ভারতের দাবী নির্ভীক ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবজীবনের সাড়া পৌঁছিয়াছে। মহাত্মাকে এই রাষ্ট্র-সভায় বৃটেনের পরম হিতৈষী বন্ধু-রূপেই আমরা দেখিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া তাঁর খ্যাতি ও যশঃ সেদিন ভারত-ব্যাপ্ত হইয়াছিল; ভারতবর্ষে তাঁর মত নির্ভীক রাষ্ট্রবীরের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতের ভাগ্যাকাশে যে মেঘ শনৈঃ শনৈঃ ঘনীভূত হইতেছিল তাহা দূর করিতে না পারিলে, আসন্ন

বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে ভারতবাসী যে একেবারে নিশ্চিহ্নপ্রায় হইবে, এইরূপ আশঙ্কা অমূলক ছিল না; কিন্তু মহাত্মার বৃটনপ্রীতি দেখিয়া সেদিন ভারতের জাতীয়পন্থী যাঁহারা, তাঁহারা নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "......When England is at war, India should not hamper her by pressing for right, but should render readily all the help that she could." ইংলণ্ড যখন মহাযুদ্ধে সংলিপ্ত, তখন ভারতের দাবী লইয়া তাহাকে বিব্রত না করাই ভাল; বরং ভারতের সাধ্যমত সাহায্য করাই উচিত।" কিন্তু তাঁহার এই কথা কংগ্রেসমণ্ডপে সেদিন কেহ কর্ণপাত করেন নাই। স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী জলদগর্জ্জনে ঘোষণা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও বিবি বাসন্তী সভাস্থল প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলীর করতল-ধ্বনিতে উৎসাহের অবধি ছিল না। মহাত্মা সেদিন ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের যথার্থ পরিচয় পাওয়ায় জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। মহামতি গোখ্‌লের নিকট হইতে তিনি রাষ্ট্রসাধনার যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সহিত তাহার সামঞ্জস্য ছিল না।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শক্তি, কর্ম্মতৎপরতা ও সৎসাহসের পরিচয়ে দেশবাসী তাঁর প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি ভারতের রাষ্ট্র-চক্রের কর্ণধার হইলে জাতীয় শক্তিকে সুশৃঙ্খল ভাবে লক্ষ্যের প্রতি লইয়া যাইতে যে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। মহাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বাসন্তী বিবির কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য—"Among us is dwelling for brief space, one whose presence is a benediction and whose feet

sanctify every house into which he enters—Gandhi our martyr and saint........ as I stood for a moment facing him, hand clasped in hand, I saw in him that deathless spirit which redeems by suffering and in death wins life for others......I recognise in this man so frail and yet so mighty, one of those whose names live in history among those, of whom it is said "He saved others, himself he could not save" অর্থাৎ "আমাদের সম্মুখে গান্ধী যুগপৎ সহিদ এবং ঋষি, যাঁর উপস্থিতিতে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠে, যে গৃহে পদার্পণ করেন সে গৃহ পবিত্র হয় .....এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে দুজনে করবদ্ধ হইয়া অনুভব করিতেছি, মরণজয়ী আত্মা দুঃখের পাষাণ-ঘর্ষণেই উদ্বুদ্ধ হয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জগৎকে জীবনের সন্ধান দেয়......এই ক্ষীণজীবী অথচ মহাবীর্য্যময় মানুষটী, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন, যিনি আপনাকে বলি দিয়া অন্যের জীবন রক্ষা করেন।"

বিদুষী, ভারতধর্ম্মপরায়ণা এই বিদেশিনীর দৃষ্টি অভ্রান্ত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বাংলার জাতীয় যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত প্রবীণ অম্বিকাচরণ রাউলাট আইনের কৃষ্ণমেঘ আকাশে ঘনাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট মহাত্মার দিকে অঙ্গুলীসঙ্কেত করিয়া বলিয়াছিলেন—"Mr. Gandhi who has gained valuable experience by his long and strenuos struggle in South Africa and who is destined before-long to take the helm of the Congress in his hands is present." "দক্ষিণ

আফ্রিকায় দীর্ঘদিন সংগ্রাম করিয়া যিনি গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধী আজ উপস্থিত, অদূর ভবিষ্যতে বিধাতা তাঁর হস্তেই কংগ্রেসের নেতৃত্বভার অর্পণ করিবেন।"

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এই সকল কথার মর্ম্ম তলাইয়া সে দিন বুঝেন নাই, তাঁর এদিকে কাণ ছিল না; তিনি তখনও পর্য্যন্ত ভারতে সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক সংস্কার সাধনে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীমশক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছেন, রাষ্ট্র-স্বাধীনতার দাবী তখনও তাঁর অন্তর্য্যামীর পাঞ্চজন্যে ধ্বনি তুলে নাই। বাহিরের দিক্ হইতে কোন প্রেরণা, উৎসাহ, আশা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, আবাল্য তিনি কাণ পাতিয়া অন্তর্দেবতার বাণীই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন; প্রশংসাবাক্যে, অখ্যাতি-প্রচারে মহাত্মাকে আমরা এক দিনও প্রসন্ন বা বিরক্ত হইতে দেখি নাই—ইহা তাঁর অসাধারণ জীবনেরই সুস্পষ্ট পরিচয়।

সেদিন মহাত্মা জানিতেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতের তিনি একজন নাগরিক। নাগরিকের কর্ত্তব্য রাজসেবা, রাজার কর্ত্তব্য নাগরিকের ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করা—বিনা দ্বিধায় এই নীতি বরণ করা ছাড়া সেদিন তাঁর রাষ্ট্রসমস্যা অন্য কিছু ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস আইন-ভঙ্গের সংগ্রামে বিদ্বেষ তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্য-পথে অন্ধকার সৃষ্টি করে নাই, ঘৃণা কোন মানুষকে তাঁর হৃদয় হইতে মুছিয়া দিতে পারে নাই, শত্রু মিত্র তুল্য করিয়া দেখার সাধনা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, "অপরিগ্রহ" ও "সমতা" গীতার এই দুইটী মন্ত্র একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় তখনও তিনি সাধিয়া চলিয়াছেন; ১৯২০ খৃষ্টাব্দেও তাঁর মনে এই ভাব ব্যতীত অন্য ভাবের উন্মেষ হয় নাই।

"To every Englishman in India" এই পত্রে তিনি তাঁর এই মর্ম্মকথাই ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি সেদিন গর্ব্ব করিয়াই বলিয়াছেন—"No Englishman served the Government more faithfully than me during twenty-nine years of my public life." "আমি এই উনত্রিংশ বৎসর বয়সের মধ্যে যেরূপ অকাতরে বৃটনের সেবা করিয়াছি, কোন ইংরাজ তাহা করিতে পারেন নাই।" তাঁর এই কথা সরল মনের সহজ কথা, এক বিন্দু অতিরঞ্জিত নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বাধার বস্তুকে তিনি কোন দিন বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন নাই; ডার্ব্বানে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ জনতা তাঁহাকে নির্ম্মম প্রহার করিলেও, তাহাদের শাস্তি দেওয়ার কথা উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"I hope God will give me courage and sense to forgive them"—"তাহাদের ক্ষমা করার ধৈর্য্য ও সাহস দিয়া ভগবান আমার সহায় হউন।"

মিঃ চেম্বারলিন প্রিটোরিয়ায় গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হওয়ায়, বুয়র যুদ্ধে, জুলু-বিদ্রোহে বৃটেনের সহায়তা করার কথা তুলিয়া ট্র্যান্সভালের ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার পূর্ব্ব-কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে, তিনি সেবার প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশা রাখেন না—এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন। তাঁর নির্য্যাতন লাঞ্ছনার কথা অকথ্য; কিন্তু নির্য্যাতনকারীর উপর তাঁর বিরক্তি বা দ্বেষ হয় নাই। মানুষের মনে যে পাপ এখনও সঞ্চিত, তাহা হরণ করার তাগিদেই যেন তাঁর জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছা-যন্ত্র। জোহেন্সবার্গের মহামারীর সময়েও তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে মৃত্যুভয় না রাখিয়াই সপরিবারে হাঁসপাতালের

ব্যবস্থায় ও রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লয়েড জর্জ্জের কাছে ইউরোপের মহাযুদ্ধে তিনি বৃটেনের সাহায্যকল্পে তাঁর শীর্ণদেহখানি উৎসর্গ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দৈবের সঙ্কেতে তিনি ভিন্নপথে চালিত হইলেন, হঠাৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ভারতের অভিমুখে ফিরিতে হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেও তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না—অমৃতসরের কংগ্রেসে মণ্টেগু-রিফর্ম-বিল সমর্থন করার আকুলতায় ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল; ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর যুদ্ধ-সভায় তিনি ভারতের সাহায্যদানে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি সেদিন গুজরাটের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যদিও বুঝিয়াছিলেন, বৃটেনের প্রতি ভারতীয়দের আস্থা আদৌ নাই, তত্রাচ দেশবাসীর নিকট উপেক্ষিত, অপমানিত হইয়াও তিনি অর্থ ও লোক সংগ্রহে বিরত হন নাই; তাঁর এই আন্তর্জাতিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের যে শিক্ষা, সভ্যতা, তাহাতে আমাদের যে মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃটেনের সহিত ভারতবাসীও তাঁহার প্রতি নিঃসংশয় নন। তিনি আজও অব্যর্থ চরণে সত্যের অনুসরণে চলিয়াছেন, বৃটেনের এই পরম বন্ধু আজ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"The last war has shown as nothing else has, the satanic nature of the civlisation that dominates Europe to-day. Every canon of public morality has been broken by the the victors in the name of virtue. No lie has been considered too foul to be uttered. The motive behind every crime is not religious or spiritual, but grossly

material. ......Europe to-day is only nominally Christian, in reality it is worshipping Mammon." ইহার মর্ম্মার্থ :—

"ইউরোপের সংগ্রামে ইউরোপের সয়তানী স্বরূপটা বাহির হইয়াছে ; ধর্ম্মের নামে মানুষের জীবন-নীতির মূল বেদী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করা হইয়াছে ; মুখে অজস্র মিথ্যা কথা আর পাপ বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে আর লক্ষ্য নাই। ভোগ ও স্বার্থসাধনে অন্যায়কে আশ্রয় করা হইয়াছে ; ইউরোপ আজ নামে খৃষ্টান, প্রকৃতপক্ষে দৈত্যের উপাসক হইয়াছে।"

যেখানে অন্যায় ও পাপের অনুভূতি তাঁর চিত্তে পীড়া দান করে, সেইখানেই তিনি 'সয়তান' শব্দ ব্যবহার করেন। ভারতের অস্পৃশ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বলেন—"Untouchability is an invention of Satan" "ভারতে অস্পৃশ্যতা সয়তানের সৃষ্টি।" কোন গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া যখন তিনি "সয়তানী" বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকে না ; পাপের পরিচয়, অন্যায়ের পরিচয় দিতে মহাত্মা এই শব্দ ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হইয়াছেন—ভারতীয় চরিত্রবান মানুষ ইহা অনুভব করিবেন। শব্দের সহিত ভাব-গ্রহণের গভীর অনুভূতি না থাকিলে, মহাত্মার এই বাণীই তাঁহার চরিত্রে মসীলেপনের আনুকূল্য করিবে এবং এই ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হয় নাই।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাত্মা নীরবে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন ; কিন্তু ঠিক ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘর্ষে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেও যখন রাউলাট-আইন-প্রবর্ত্তনের সূচনা

হইতেছে, বাসন্তীবিবির সহিত অরুণ্ডল ও ওয়াডিয়াকে অন্তরীত করা হইয়াছে, তখনও মহাত্মা অবিচল থাকিয়া চম্পারণে, কায়রায়, আমেদাবাদের শ্রমিক ধর্ম্মঘটে অর্থনীতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাউলাট আইনের প্রতিবাদ করিতে মহাত্মা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। এই দিন হইতে তিনি ভারতের রাষ্ট্রসমস্যায় নিজেকে জড়াইয়া ফেলিলেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সত্যই সেদিন মহাত্মা ব্যতীত আর যোগ্যতর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। হোমরুল আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঢাকা পড়িয়া গেল। রাষ্ট্র-গগনে যে সকল ভাস্বর নক্ষত্র আলোক দান করিতেছিল, তাহা কোথাও বা ঢাকা পড়িল, কোথাও বা লক্ষ্যচ্যুত হইয়া চিরদিনের ন্যায় কালের গহ্বরে ডুবিয়া গেল। ভারতের ধর্ম্ম-যজ্ঞের ঋত্বিক্‌ ভারতের রাষ্ট্রচক্র ধারণ করিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সহিত নিজের সবখানি শক্তি সংযুক্ত করিয়া দিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিনিধিমণ্ডলী তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। পাঞ্জাবের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহাত্মার সহিত একত্র হইলেন। পণ্ডিত মতিলাল, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, চিত্তরঞ্জন, রাজগোপালাচারিয়া প্রভৃতি ভারতের উদীয়মান শক্তি মহাত্মার পথ-সঙ্কেতে উদ্ধত-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

ভারতে আবার নূতন সাধনা প্রবর্ত্তিত হইল। বাংলায় এতদিন যাহা কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া পাক খাইতেছিল, মহাত্মার যাদুমন্ত্রে তাহা জীবন্ত বেশে দেশকে নূতন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিল। ভারতের রাষ্ট্র ত্যাগ তপস্যার ক্ষেত্র-রূপে পরিণত হইল। দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্তবর্গ দলে দলে গান্ধীর ডাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন। বাংলার কবি চিরদিন জাতীয় জাগরণের অমর স্পর্শ মর্ম্ম দিয়া অনুভব

করেন; তিনিও মাথা হইতে গৌরব-মুকুট ধূলায় নিক্ষেপ করিলেন। নাগপুরের কংগ্রেসে যেন মহাত্মার প্রভাব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিল। বিপিনচন্দ্রের অনুগামী দেশবন্ধু মহাত্মার অসহযোগ-প্রস্তাব নাকচ করার জন্য সদলবলে উপস্থিত হইয়া, একেবারে তপস্যার দীক্ষা লইয়া বাংলায় ফিরিলেন। ভারতব্যাপী এমন বিরাট্ আন্দোলন স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করে নাই; সে অভিনব প্রেরণায় ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জাগিয়া উঠিল।

কলিকাতার কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরোজী ভারতকে "স্বরাজ"মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। স্বরাজের আদর্শ নানা অর্থে নানা শ্রেণীর রাষ্ট্রধর্ম্মী প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু নাগপুরে "স্বরাজের" যে ধ্বনি বাহির হইল, বুদ্ধিজীবী তাহার কোন যুক্তি না পাইয়া, উহা "ম্যাজিক" বলিয়াই পরিহাস করিল। ভারতের রাষ্ট্রে, স্বরাজের আধ্যাত্মিক অর্থ দলভেদ সৃজন করিল। এই স্বরাজ দাদাভাই নৌরোজীর স্বরাজ নহে; শ্রীঅরবিন্দ যে স্বরাজের কথা, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব যে স্বরাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মহাত্মা তাহার অন্য অর্থ বাহির করিলেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলন, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, আর চরকা—ইহাই হইল স্বরাজ প্রাপ্তির অস্ত্র, অসহযোগ ইহার প্রয়োগ। এই "স্বরাজ" আদর্শস্বরূপ লক্ষ্যে রাখিয়াই মহাত্মা কংগ্রেসকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা ভারতীয় সাধনারই পরিপূর্ণ বিগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শুদ্ধি-যজ্ঞে জাতির প্রাণ নূতন করিয়া গড়িয়া তোলায় তিনি তৎপর হইলেন। জাতির একটা নব জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল, মহাত্মা সেই পথে কংগ্রেসকে লইয়া চলিলেন। এই বৎসরে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সের ভারতপর্য্যটন ব্যাপার লইয়া হরতাল আন্দোলনে

বোম্বাই সহরে ভীষণ দাঙ্গা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের নামে বোম্বাইয়ে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় দেখিয়া মহাত্মা এই সময়ে পাঁচদিন উপবাস করেন। গভর্ণমেণ্ট অসহযোগ-নীতি দমনে কৃতসঙ্কল্প হন ; ইহার ফলে ভারতে বিশ হাজার কংগ্রেস-সেবক বন্দী হন। আহ্মেদাবাদের কংগ্রেসে আবার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল ; মহাত্মা স্বয়ং বারদোলীতে খাজনা বন্ধ করার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইহার জন্য দিন স্থির হইল ; কিন্তু ইহার পরই চৌরিচৌরায় যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহাতে মহাত্মা রাজনীতিক আন্দোলন হইতে এক প্রকার প্রতিনিবৃত্ত হইতেই চাহিলেন। তিনি হিংসা-বৃত্তির উচ্ছেদসাধন করিতেই যেন রাজনীতিক ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। জাতির জীবন বিশুদ্ধ হইলেই তার মুক্তি হইবে, এই বিশ্বাসই তাঁহাকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আহ্মেদাবাদে, ভিরগ্রামে ও খেদায় ভীষণ হিংসাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। চৌরিচৌরার ঘটনায় তিনি আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না, ঘোষণা করিলেন—"I announce my intention to stop the mass civil disobedience which is to be immediately started in Bardoli."

কংগ্রেসের একপক্ষ ইহাতে মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইল ; তিনি যে ভারতের রাষ্ট্রনীতি পরিচালন করার যোগ্য নহেন, ইহাই প্রচারিত হইতে লাগিল। মহাত্মাও ঘোষণা করিলেন—কংগ্রেস চরকা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সমাজসংস্কার লইয়া কার্য্য করুক। তিনি বলিলেন— "...The constructive programme has been framed, it will

steadily calm us, it will wake our organising spirit, it will make us industrious, it will render us fit for Swaraj, it will cool our blood."

"গঠননীতির কাজে আমরা শান্ত ও ধৃতিশীল হইব, আমাদের সংহতিশক্তি জাগ্রত হইবে, আমরা পরিশ্রমী হইব, স্বরাজের অধিকারী হইয়া উঠিব—ইহাতে আমাদের রক্তের উষ্মা দূর হইবে।"

ইহা হইতেই মহাত্মা ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে কোন পথে লইয়া যাইতে চাহেন, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। দেশের উত্তেজিত তরুণেরা তাঁর এই কথা কাণে লইলেন না। কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশন হইতে তিনি কংগ্রেসের সহিত নিবিড়তর সংযুক্ত হইয়া নির্ভীকভাবে কার্য্য করিতেছিলেন; দেশের প্রাণশক্তি জড়তাযুক্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তাঁর নেতৃত্বে দেশের সুপ্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিল। নাগপুরের "স্বরাজ" হেঁয়ালীপূর্ণ হইলেও অসহযোগ-নীতি রাজসিকভাবপ্রবণ ভারতবাসীর প্রাণে সাড়া তুলিয়াছিল। কিন্তু চরকা, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য, আর সমাজ-সংস্কার কার্য্যে উত্তেজনার নেশা নাই দেখিয়া অনেকেই বিমুখ হইলেন। মহাত্মা এইবার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন—"জাতির অভীষ্ট সিদ্ধলাভ করিতে হইলে আত্মবলির আয়োজন করিতে হইবে; ত্যাগ ও তপস্যার ভিতর দিয়াই সে আত্মোৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়, এই পথেই যথার্থ মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচলিত রাষ্ট্র স্বাধীনতা এই মুক্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ। আজ পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দ তাহাদের স্বার্থরক্ষায় পশুবলকে আশ্রয় করিয়াছে, অস্ত্রত্যাগের আন্দোলন একটা কপট কলরব মাত্র; ভারতকে প্রমাণ করিতে হইবে—অস্ত্রবলের অপেক্ষা আত্মিক বল শ্রেষ্ঠ, ভারতই নিরস্ত্রীকরণের স্বপ্ন সফল করিতে

পারে। রক্ত-মাংসের জিঘাংসাবৃত্তি অতিক্রম করিয়া আমাদের আত্মজয়ী হইতে হইবে; একদিন জগৎ দেখিবে, অহিংস ভক্তিনম্র পশুবলহীন মহামানব-সঙ্ঘ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র হইয়াও জগৎশাসনের অধিকারী। ভারত আজ সর্ব্বহারা—ধনবল, সংহতিবল, অস্ত্রবল নাই; কিন্তু ভারত-বাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে যে তপঃশক্তি আছে, তাহার অভ্যুদয়ে যে 'অধ্যাত্ম-সংগ্রাম বাড়িবে, তাহাতে প্রবল জড়শক্তি মাথা নত করিবে। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় আজ স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, হোমরুল বলিয়া যে চীৎকার উঠিয়াছে, ইহা আমার লক্ষ্য নয়।" ......"Our battle is a spiritual battle, a fight for humanity." "আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ করিব, মনুষ্যত্বের জন্য এই সংগ্রাম।" মানুষ আজ স্বার্থজড়ীভূত নাগপাশাবদ্ধ। মহাত্মানির্দ্দিষ্ট মুক্তিইআমাদের লক্ষ্য। আমরা 'নেশন' শব্দের পরিভাষা লইয়া জাতি বলিয়া যে গর্ব্ব করি, উহা পাশ্চাত্যের ধার-করা ভাব ও আদর্শ; আমরা নারায়ণ, আমাদের অন্তর্য্যামীকে জাগাইয়া ভাগবতরাজ্য গঠন করিতে হইবে, হিমালয়ের ন্যায় দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিঘ্নরাজিকে আত্মিক বলেই যদি লঙ্ঘন করিতে পারি, অস্ত্রধারীকে, ধনকুবেরকে অময় সত্তার বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে যদি তুচ্ছ করিতে পারি, তবেই আমরা স্বরাজলাভ করিব। আমাদের স্বাধীনতা—নিখিল মানবজাতির মুক্তি, ভারতের উত্থানে বিশ্বের আত্মা জাগিয়া উঠিবে।

কংগ্রেসের নামে যে শক্তি সংহতিবদ্ধ হইয়াছিল, মহাত্মার এইরূপ উক্তিতে তাহা ছন্নছাড়া হইয়া পড়িল, চতুর্দ্দিকে মহাত্মা ভীরু অব্যবস্থিত চিত্ত বলিয়া চীৎকার উঠিল, মহাত্মা বলিলেন—"Let them jear! I have this faith."

রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম

লর্ড রীডিং সুযোগ পাইলেন, দেশের উপর মহাত্মার যে প্রতিপত্তি দেখিয়া রাজশক্তি ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তাহা হ্রাস হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সিডিশন অভিযোগে ছয় বৎসর কারাগৃহে বন্দী করা হইল।

খদ্দর আর সমাজ-সংস্কার লইয়া কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইল না। মহাত্মার গঠনযজ্ঞ দেশ আজও গ্রহণ করিতে পারে নাই; সেদিন যে পারিবে, এ আশাও একেবারে দুরাশা ছিল। মহারাষ্ট্রনেতা কেলকার কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব তুলিলেন; মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ইহাতে প্রস্তুত ছিল; চিত্তরঞ্জন গররাজী হইলেন না; মতিলাল জেল হইতে বাহির হইয়া ইহাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। লক্ষ্ণৌ সহরে পরামর্শসভা বসিল। মহারাষ্ট্রের কোন নেতাই এই সভায় যোগদান করিলেন না। অসহযোগ-প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইল; কিন্তু তাহা উপস্থিত সম্ভব না হওয়ায় মহাত্মার গঠননীতিই পরিগৃহীত হইল। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে "স্বরাজদল" গড়িয়া উঠে, মহাত্মার প্রস্তাবগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করা সাব্যস্ত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি ঘটিল। স্বরাজ্যদলের অভ্যুত্থান ভারতে এক অপূর্ব্ব ঘটনা! বাংলার চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য চুক্তি করিয়া বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। মহাত্মা ছয় বৎসর কারাগৃহে রহিলেন না, বিধাতা তাঁহাকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই মুক্তি দিলেন। বেলগাঁও কংগ্রেসে তিনি গঠন-যজ্ঞের উপর জোর দিয়া বলিলেন—"I have thus dilated upon the spinning wheel, because I have no better or no other message for the nation." "চরকার কথাই বিশেষ করিয়া বলি, কেননা জাতির জন্য নূতন কিছু দিবার আমার নাই।"

"No changer" ও "Pro-changer" লইয়া কংগ্রেসে যে দলভেদ ঘটিয়াছিল, বেলগাঁও কংগ্রেসে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। মহাত্মা স্বরাজদলের সহিত চুক্তি করিলেন। তারপর দিল্লীতে ভারতের রাজনীতিক সকল দলের মিলন-সভা। মিসেস্ বেশান্ত ও তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং অন্যান্য লিবারেল দলের নেতারা ইহার পূর্ব্বে "Commonwealth of India Bill" নামে ভারতের সংস্কারনীতির এক খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। স্বরাজ্যদলের প্রচেষ্টায় দ্বৈত গভর্ণমেণ্ট যে অচল, তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একত্র হইয়া "স্বরাজ স্কীমের" খস্‌ড়া করিলেন। সাইমন কমিশন নিয়োগ করার পূর্ব্বেই ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারতশাসননীতির একটা স্কীম বিলাতের পার্ল্যামেণ্টে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের এই শেষ কণ্ঠধ্বনি—ইহার দেড়মাস পরেই সমগ্র ভারতের মাথায় বজ্রপতন হইল; দেশবন্ধুর বিয়োগে দেশজননী বিয়োগবিধুরা হইলেন। ফরিদপুর কংগ্রেসে দেশবন্ধু "স্বরাজের" চিত্র-পরিচয় দিয়া শেষে বলিলেন—এই স্বরাজ "within the Empire if the Empire will recognise our right and outside the Empire if it does not." "ভারতের দাবী যদি বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করে, স্বরাজ ইহার অন্তর্গত হইবে। ইহার অন্যথা হইলে, ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।" তার পর, তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া ভারতের সহিত বৃটেনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া

বলিলেন—"I think it is for the good of India, for the good of the world, that India should strive for freedom in the Commonwealth and so serve the cause of humanity." "বৃটনের সহিত সংযুক্ত-স্বার্থ লক্ষ্যে রাখিয়া ভারতের মুক্তি-যাত্রা, ভারত ও বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিবে, মানব জাতির ইহাতে মঙ্গল হইবে বলিয়া আমি মনে করি।" আর সে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র—"the great Commonwealth of Nations called the British Empire." "বৃটন ও ভারতের যুক্ত-স্বার্থ লইয়া যে জাতি, তাহাই বৃটিশ সাম্রাজ্য।" বাংলায় তরুণের চিত্ত দেশবন্ধুর কথায় সে দিন উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে দেশবন্ধু আপনাকে সম্যক্ প্রকারে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অহিংস-মন্ত্রে দীক্ষা এইদিন সম্পূর্ণ আকারে দেখা দিয়াছিল; কিন্তু বাংলার বিপ্লবপন্থী দেশবন্ধুর বাণীতে সান্ত্বনা পায় নাই। ফরিদপুরের প্রাদেশিক সভার বাণী বিলাতের মন্ত্রিসমাজের কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের "জেশ্চার" দেখার আশায় বাঙ্গালী উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন বাংলার উদীয়মান তরুণ প্রায় সকলেই ভারতশাসন আইনে কারারুদ্ধ। কিন্তু দেশবন্ধুর প্রাণবায়ু শেষ হইল, রাজমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের "জেশ্চার" আসিয়া পৌঁছিল না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মা স্বরাজদলকে বেলগাঁও কংগ্রেসের সকল সর্ত্ত হইতে মুক্তি দান করেন; তিনি স্বয়ং নিখিল-ভারত-চরকা-সঙ্ঘ গঠন করিয়া কংগ্রেসের গঠনকার্য্যটুকু আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

কংগ্রেস হইতে লিবারেল দল পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। হিন্দু

মুসলমান-বিরোধ পুনরায় দেখা দিল। গৌহাটীতে মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। কাউন্সিল-প্রবেশই রাজনীতিক লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। কংগ্রেসের কাউন্সিল-প্রবেশের পথে রেস্‌পন্‌সিভ্‌ দল ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া প্রবেশ করিল। জাতীয় দাবী বলিয়া নেহেরু স্কীম্‌ এসেম্‌ব্লীতে গৃহীত হইল না। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান-কলহ ব্যতীত জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও দলাদলি দেখা দিল। কিন্তু এই সময়ে বড়লাট বাহাদুর সাইমন-কমিশন নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করিলেন। এই কমিশনে ভারতীয়দের স্থান ছিল না। বোম্বাইয়ে, কলিকাতায়, এলাহাবাদে আবার সম্মিলিত রাষ্ট্র-সভা বসিল। মহাত্মা নিখিল-ভারত-চরকা-সঙ্ঘ লইয়া নীরবে কংগ্রেসের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, যেন তাঁহার নেতৃত্ব-গ্রহণের সময় তখনও আসে নাই। মাদ্রাজে ডাঃ আন্‌সারীকে সভাপতির আসনে বসাইয়া আবার কংগ্রেসের শক্তি মাথা তুলিয়া উঠিল। ডাঃ আন্‌সারী বলিলেন— "আমরা কংগ্রেসের জীবনকালের পঁয়ত্রিশ বৎসর গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছি, দেড় বৎসর অসহযোগী হইয়া রহিলাম, এই চারি বৎসর কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া বাধা সৃষ্টি করিয়াছি—"co-operation has led us no-where, obstruction within the Councils has not given us any better results...... Non-co-operation did not fail us, we failed non-co-operation......" "সহযোগ করিয়া এক পা অগ্রসর হওয়া যায় নাই, কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া বাধা সৃষ্টি করায় কোন ফল ফলে নাই; অসহযোগ আমাদের ব্যর্থ করে নাই, আমরাই অসহযোগী হইতে অসমর্থ হইয়াছি।"

শেষে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে রাষ্ট্র-যজ্ঞের নবীন পুরোহিত ভীম রুদ্র কণ্ঠে বলিলেন—"This Congress declares the goal of the Indian people to be complete national independence." ভারতীয়দের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা, কংগ্রেস হইতে এই ঘোষণা-ধ্বনি উঠিল। সকল শ্রেণীর রাষ্ট্র-পুরোহিতগণ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। বিগত চারি বৎসর অসহযোগ নীতি পালন করার পথে জাতির ছত্রভঙ্গ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, দেশের প্রাণে নূতন আশার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মা নীরবেই কংগ্রেসের গতি তখনও লক্ষ্য করিতেছিলেন।

তারপর কলিকাতার কংগ্রেস। ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সূচনা এই বাংলাদেশ হইতেই ঘটিয়াছিল, পরিণতির সম্ভাবনায় জাতীয় কংগ্রেস বাংলার বুকে আসিয়া দেশ-জননীর পূজাবেদী গড়িয়া তুলিল। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-ভেরী বাজিয়াছিল; সে মুক্তিযজ্ঞের সাধনে বাঙ্গালীর যে চরমশুদ্ধির প্রয়োজন ছিল, তাহার অভাবে সে মহাযজ্ঞ পণ্ড হইয়াছে। বাংলার চরম সঙ্কট-যুগে যখন কোথাও হইতে আর আশ্বাসের নিঃশ্বাস-ধ্বনিও শুনা যায় না, তখন রুদ্ধ কপাটে করাঘাত করিয়া অরবিন্দ সাধনার সঙ্কেত দিয়াছিলেন—"A greater *mantram* than "*Bandemataram*" has to come. Bankim was not the ultimate seer of Indian awakening. He gave only the term of initial and public worship, not the form and the ritual of the inner secret *upasana*···when the *mantram* is practised even by two or three, then the closed Hand will begin to

open ; when the *upasana* is numerously followed, the closed Hand will open absolutely." "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের চেয়ে সিদ্ধ মন্ত্র আছে, তাহা আসিবে। ভারতের জাগরণ-কল্পে বঙ্কিমই শেষ ঋষি নহেন। তিনি দীক্ষার বিধান দিয়াছেন, দেশ-পূজার সঙ্কেত দেখাইয়াছেন, সেই নিগূঢ় উপাসনার সাধনপদ্ধতি দেন নাই। সিদ্ধমন্ত্রসাধনে দুই জন তিন জন মানুষ যেদিন উদ্বুদ্ধ হইবে, বিধাতার মুষ্টি সেদিন খুলিতে আরম্ভ করিবে ; অসংখ্য নারীপুরুষ তাহার অনুসরণ করিলে, বিধাতার হস্তমুষ্টি সম্পূর্ণ খুলিয়া যাইবে।" শ্রীঅরবিন্দ সে সাধনার সঙ্কেতও দিলেন—"It is a a national *Atma-samarpana*—self-surrender that God demands of us and it must be complete"—"ইহা জাতির আত্মসমর্পণ, আত্মোৎসর্গের মহাযজ্ঞ, ভগবানের চাওয়া, ইহাতে পূর্ণাহুতি দিতে হইবে।" বিচিত্র ভারত-সত্তার মহিমা ; তিনি যখন যাঁহাকে আশ্রয় করেন, তখন তাঁর অনাহত সনাতন সুরটাই সেই মহানেতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ; আজ বিশ বৎসর পরে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী জাতির মুক্তি ও নবজন্মলাভের অব্যর্থ নির্দ্দেশ এই আত্মসমর্পণ-মন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন। মহাত্মার কণ্ঠে বিজয়বিষাণ বাজিল—"We must reduce ourselves to a cypher. Not until we have reduced ourselves to nothingness can we conquer the evil in us. God demands nothing less than complete *self-surrender* as the price for the only real freedom that is worth having and when a man thus loses himself, he immediately finds himself in the service of all

that lives. It becomes his delight and his re-creation. He is a new man, never weary of spending himself in the service of God's creation."

ইহার মর্ম্মার্থ—

"আমাদের রিক্ত হইতে হইবে; পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গ হইতে না পারিলে আমাদের মধ্যে যে অসুর অবস্থান করে, তাকে জয় করা যাইবে না। পরিপূর্ণ উৎসর্গের মূল্য দিয়াই ভগবান যথার্থ মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে আত্মদান করে, সেই সর্ব্বভূতের সেবার অধিকারী হয়; সে তখন অমৃতের পুত্র স্বয়ং নারায়ণ। মানুষের ইহা নব জন্ম; সে জগদ্ধিতায় আপনাকে নিঃশেষে দিতে কোন ব্যথাই অনুভব করে না"।

ভারতের এই সুর সেদিন কলিকাতার কংগ্রেসে শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মতিলাল নেহেরুর পশ্চাতে মহাত্মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তরুণের চিত্ত সংক্ষুব্ধ—মাদ্রাজের স্বাধীনতার সঙ্কল্প কলিকাতার কংগ্রেসে সমর্থিত হওয়ার উত্তেজনায় বাংলার তরুণ হোতা সুভাষচন্দ্র উন্মুখ, জহরলাল উদ্বুদ্ধ। নেহেরু-রিপোর্টে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী করা হইয়াছে; পূর্ণস্বাধীনতার দাবী যদি সমর্থন করা হয়, তবে নেহেরু-রিপোর্টের কোন অর্থ থাকে না। মহাত্মা শিষ্য ভক্ত মতিলাল নেহেরুর মর্য্যাদা, জাতীয় কংগ্রেসের মহিমা, জাতির গৌরব রক্ষা করিতে আবার মাথা পাতিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন—বিলাতের পার্ল্যামেণ্টে যদি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষদিনের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ সমর্থিত না হয়, তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রণী হইবেন। এই বৃদ্ধের ত্যাগপ্রদীপ্ত বদনমণ্ডলে যে স্বর্গের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল, তাহা

বিস্ময়মুগ্ধ অসংখ্য নরনারীর চক্ষু এড়াইল না—মহাত্মার জয়রবে কংগ্রেস-মণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল।

তারপর, লাহোর কংগ্রেস। ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিশেষে কংগ্রেসের হুমকীতে বিলাতের মন্ত্রিসমাজ যে 'নেহেরু-রিপোর্ট গ্রাহ্য করিলাম' বলিয়া ঘোষণা করিবেন, এমন আশা অর্ব্বাচীন শিশুর পক্ষেও 'অসম্ভব অথচ সত্যপরায়ণ মহাত্মার বাণী মিথ্যাও হইবে না। স্বাধীনতার পথে জাতিকে পরিচালিত করা মহাত্মা ভিন্ন অন্যের সাধ্যে কুলাইবে না; চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব-পদ দিতে অনুযোগ আসিল। মহাত্মা বলিলেন—"It is well-understood, I am out of tune with many things done by Congress." সভাপতি হওয়ায় আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া আরও বলিলেন—"my occupancy of the chair can only embarrass everybody including myself." "আমি জানি, কংগ্রেসের অনেক কার্য্যের সহিত আমার মিল নাই; তা' ছাড়া কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ আসনখানি আমি অধিকার করিলে অনেকে বিব্রত হইবেন, আমিও বাদ পড়িব না।" তিনি পণ্ডিত জহরলালকে এই পদে বরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

মহাত্মার রাষ্ট্রনীতি দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু তিনি যে ভারতের মুক্তি-বিধাতা, একথা সেদিন ভারতের তরুণ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—আজও মহাত্মার অসাধারণ রাষ্ট্র-নীতির মর্ম্ম বুঝিতে অনেকে অক্ষম। সেদিন মহাত্মাকে লোক-চক্ষে হেয় করার জন্য একদল লোক মাথা তুলিয়াছিল, তাঁর উপরোক্ত বাণীর প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়া বলিয়াছিল, মহাত্মার নিকট সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া জাতি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিবে কি অন্য

কোন জননায়ককে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিয়া লইবে! আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলাম, বাংলার তরুণবর্গের মধ্যে এই শ্রেণীর স্বপ্নদর্শীর সংখ্যা অধিক; মহাত্মার নিগূঢ় অধ্যাত্ম-নীতির গতি বাঙ্গালী কেন তলাইয়া বুঝে না, ইহা খুব আশ্চর্য্য কথা! আমাদের মনে হয়, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বাঙ্গালী ঋজু পথে না চলিয়া ক্রমে সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি, অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় ত্যাগ ও তপস্যার অনির্ব্বাণ আগুন এখনও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; তাই মহাত্মার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা বাঙ্গালীকে ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভাবে যেদিন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে দেখিব—একদিন বিধাতা যেমন বাংলার মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরাইয়া বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বের সম্মুখে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, আবার সেদিন বাঙ্গালী ভারতের নেতৃত্ব করার অধিকারী হইবে।

ভবিষ্যমানব-সমাজের কল্যাণকামনায় জগতের পরীক্ষিত সকল নীতিই যে ব্যর্থ হইয়াছে, চিন্তার বিলাসমগ্ন বাংলার একদল তরুণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না; তাই তাঁরা সেদিন মহাত্মার ত্যাগ-তপস্যার বিধান ঠেলিয়া স্বাধীনতার পথে যে মরিচাধরা ব্যর্থ অস্ত্র-রাশি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, মহাত্মাকে হিমালয়ে প্রেরণ করার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

কিন্তু মহাত্মা কলিকাতার কংগ্রেসের পর সমগ্র ভারতবর্ষে অহিংস আন্দোলনের অধিকারী মানুষের সন্ধান করিতেছিলেন। কংগ্রেসের তখন চারি মাস কাল বাকী আছে। মহাত্মার প্রতিশ্রুতি বজ্রের অপেক্ষা কঠিন, অমোঘ, অব্যর্থ; কূট-বুদ্ধির চালে, ভাবে ভাষায় তাহা অস্পষ্ট

নহে। এই জন্ম-তপস্বী জানিতেন, ভারতীয় ভাবে দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন সিদ্ধ করিতে হইলে সেনাপতির সঙ্কেতে সৈনিকবৃন্দ যেমন অকাতরে প্রাণ দিতে অকুণ্ঠ হয়, কংগ্রেসপন্থীকে আজ সেইরূপ একটী অঙ্গুলীসঙ্কেতে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কলিকাতায় তরুণের দাবী এক বৎসরের জন্য চাপা দিয়া তিনি একদিকে যেমন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সুবিচার-প্রাপ্তির আশায় দিন গণিতেছিলেন, অন্য-দিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞাপূরণের জন্য তেমনি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়াও তুলিতেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর কম্বুকণ্ঠে গুরু গুরু অশনি-গর্জ্জন শুনা গেল। তিনি বলিলেন—বিলাতের মন্ত্রিসভা যদি ভারতের দাবী যথাসময়ে পূরণ না করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিনেই তিনি স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিবেন। স্বাধীনতাসংগ্রামে তিনিই প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবেন; কিন্তু কংগ্রেস-সভার অধিপতি হইবেন না। কোন যুক্তিই তাঁকে আলো দেয় নাই। কংগ্রেসের কর্ম্মভার-বহনের শক্তি তাঁর নাই, এই ধারণা তাঁর আবার এক ভ্রান্তি বলিয়া লোকে হাসিবে; কিন্তু ইহা তাঁহার বিশ্বাস, তবে কংগ্রেসের সেবায় তিনি জীবনের বিন্দু বিন্দু শক্তি ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠা করিবেন না। কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির দিকে নেতৃবৃন্দ নজর দিলেন; সারা ভারতে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা পাঁচ লক্ষ করার ব্যবস্থা হইল। মহাত্মা বলিলেন, কংগ্রেস যদি ভারতের মুক্তিবিধানের ব্রহ্মাস্ত্র হয়, তবে ইহার মধ্যে "Iron discipline" প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভায় সাড়ে তিন শত জনের মধ্যে যদি পঁয়ত্রিশ জন মানুষ সঙ্কল্পসাধনের যথার্থ অধিকারী হয়, বাকী লোকদের বাদ দিতে হইবে। কংগ্রেসের ক্রীড্ সহি করিয়াই কংগ্রেসের সভ্য

হওয়ার মূল্য কিছু নয়। দেশ-জননীর চরণে জাতিগত আত্ম-সমর্পণের বিগ্রহ-মূর্ত্তি কংগ্রেস। মহাত্মা কথা ও কাজ এই ক্ষেত্রে একত্র করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মার প্রাণ বাঁটিয়াই কংগ্রেস জীবন্ত শক্তি-বিগ্রহরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর যেমন প্রতি বৎসর নিঃশব্দে শেষ হয়, এবারও তাহার অন্যথা হইল না। লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন; তাহার পর তাঁর ডাণ্ডীর পথে জয়যাত্রার ইতিহাস বিশ্ববিদিত ঘটনা।. মিঃ সাপ্রু, জয়াকরের চেষ্টায় ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইনের সহিত কংগ্রেসের সন্ধি, মহাত্মার দ্বিতীয় গোলটেবিলে যোগদান, শেষে বিলাতের পার্ল্যামেণ্টে তাঁর কণ্ঠে নবযুগের পাঞ্চজন্য আবার সিংহগ্রীব বিবেকানন্দের চিকাগো-সভায় ভারতের মাহাত্ম্যপ্রচারের চিত্রই প্রস্ফুট তর করিয়া তুলিল।

ষষ্ঠি-বৎসরের বৃদ্ধ জাতীয় কংগ্রেসের আদেশ-বাণী মাথায় করিয়া যেদিন স্বাধীনতার লক্ষ্যে যাত্রা স্বরু করেন, সে অপরূপ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোন যুগে রচিত হয় নাই। তাঁহার সম্মুখে বিপক্ষ সেনাবাহিনী ছিল না, তিনি নিজেও অস্ত্রহীন, আততায়ী বলিয়া কেহ নাই—বাধা নাই—ভারত মুক্তিপ্রার্থী, এই দিব্য প্রেরণা তাঁহাকে যন্ত্রের ন্যায় সমুদ্রোপকূলে লইয়া যাইতেছিল। পরাধীন ভারতের মুক্তিযজ্ঞ পূর্ণ করার জয়যাত্রা এমন ভাবে হয়, হইতে পারে, কেহ কল্পনাও করে নাই। জগতের ইতিহাসে স্বাধীনতার পথে এমন করিয়া জাতিকে লইয়া চলা এই প্রথম। তিনি তীর্থ-যাত্রীর মতই কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতের সাড়া শুনিয়া মুক্তি-লক্ষ্যেই ছুটিয়াছিলেন। যাত্রা বন্ধ হইল যারবেদার লৌহ-কারাগারে; তারপর লর্ড আরউইনের

সহিত চুক্তি ঘটিলে তিনি নিখিল ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ সিমলা হইতে বোম্বাইয়ের উপকূলে যে দিন ছুটিলেন, সেও এক অভাবনীয় ঘটনা। তাঁর উৰ্দ্ধশ্বাস গতির ছন্দে, ভারতের ধূলিকণা পুলক-নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। ভারতীর ম্লান-মুখে সেদিন আমরা বুঝি হাসির বিদ্যুৎচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম।

ভারতে বৃটিশ শাসন-তন্ত্রের পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী বিদ্রোহী সন্তান যখন ইংলণ্ডের তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন পথের ধারে বৃটেনের নর-নারী সবিস্ময়ে দেখিল—ভারতের এই দুৰ্দ্ধর্ষ নেতা প্রলয়াগ্নিসম রুদ্র ভীষণ, কিছু নহেন; অৰ্দ্ধনগ্ন, পলিতকেশ, গলিত-দন্ত এক বৃদ্ধ সহাস্যে সকলকে অভিবাদন করিলেন। শরীর-জ্ঞান নাই, চক্ষে জ্বালাময় অগ্ন্যুদ্গিরণ নাই, সে সৌম্য শান্ত-মূৰ্ত্তি গান্ধীকে দেখিয়া বৃটেনবাসী ভাবিয়া পাইল না—এ মানুষ কেমন করিয়া ত্রিশকোটি ভারতবাসীর নেতা হইতে পারেন! এই নিরাকাঙ্ক্ষ, নিত্য-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বৃটেনের মন্ত্রিসমাজও ভাবিতে বসিলেন—ইঁহাকে কি চালে নাকাল করিবেন! চার্চ্চহিল প্রমুখ ষ্টীলফ্রেম্-রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণও সেদিন মুখ লুকাইলেন। মহাত্মা কিন্তু বৃটেনবাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিলেন—'ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছি, ভারতের হৃদয়-মণি স্বাধীনতা কোথায় তোমরা লুকাইয়াছ, ফিরাইয়া দাও, প্রেমের দাবী উপেক্ষা করিও না।' বৃটেন দেখিল, অদ্ভুত-প্রকৃতির মানুষ—গান্ধীকে তাহারা চিনিল না। আমরা সর্ব্বজনবিদিত এই সকল ঘটনা বাহুল্যবোধে বিবৃত করিলাম না।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে মহাত্মার মত মানুষের আবির্ভাব জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। রাষ্ট্র ধৰ্ম্মক্ষেত্র নহে; ভারতের অবতার-পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রকেও

রাষ্ট্র-সমস্যার সমাধানে চাতুর্য্য অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মহাত্মার অকপট কর্ম্মপন্থা এই হেতু রাষ্ট্র-সমস্যার সমাধানে অনুকূল নহে, ভারত ও ভারতের বাহির হইতেও এইরূপ কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়। চৌরীচৌরার অপরাধ জাতির অপরাধ; তিনি জাতির প্রতিনিধি, নিজের কাঁধেই অপরাধের বোঝা চাপাইয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া মহাত্মার কার্য্য পণ্ড করিল, তাহাদিগকে রাজদ্বারে গিয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিতে বলিলেন। অধ্যাত্ম-সাধনায় এ নীতি প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রে এই মারাত্মক নীতি নাকি আত্মঘাতী হওয়ারই নামান্তর। তাঁর এইরূপ যুক্তি এই হেতু অনেকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন; তিনি নিজেও স্বীকার করেন, তাঁর কর্ম্মপন্থা "politically unsound and unwise"; কিন্তু ভারতের ধাতুতে Politics বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু যে ধারণাযোগ্য নহে। তাই যখন দেখি, রাষ্ট্রসমস্যার পথে তাঁর উদার ঋজু গতি ভারতের মুক্তিপথ শনৈঃ শনৈঃ অভাবনীয় ভাবে বিঘ্নহীন করিতেছে, প্রতি বারে তিনি দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া জাতিকে আলোর পথে আনিতেছেন, তখন কি বলিব না যে ইউরোপের শিক্ষায় শুধু রাষ্ট্রে নয়, সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে, এমন কি ধর্ম্মসাধনার পথেও আমরা কূটবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া ভারতের সনাতন চরিত্র ক্ষুণ্ণ করিতেছি! পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রক্ষেত্রে চাতুরী, মিথ্যা, অবিশ্বাস যদি অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে ভারতের উন্নতি-পথ যে প্রশস্ত হয় নাই, ইহা কি অস্বীকার্য্য? মহাত্মা উচ্চকণ্ঠে ভারতের রাষ্ট্র-সাধকদের বলেন— "The patriotic spirit demands loyal and strict adherence to non-violence

and truth. Those who do not believe in them should retire from the Congress organisation." "সত্য ও অহিংসার উপর অকপট আস্থা ও আনুগত্য ভারতসত্তার দাবী; যাঁহাদের এই বিশ্বাস নাই, কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের বিদায় লওয়া উচিত।"

ত্রিশ কোটী নরনারীর মুক্তি-যজ্ঞের পুরোহিত পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য যে হিংসাযজ্ঞ, তাহা নাকচ করিয়া এই অভিনব পথে নিখিল জাতিকে যে বিশ্বাসে ও সাহসে আহ্বান করেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের সম্মুখে তিনি যেন ইহাই আজ প্রমাণ করিতে উদ্যত, যে সর্ব্বক্ষেত্রেই ধর্ম্মনীতিই মানুষের জীবন ধন্য করিতে পারে; ধর্ম্ম জগৎ-প্রাণ সমীরণের ন্যায় সর্ব্বত্রগামী, তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। রাস্‌কিন, টলষ্টয়ের বাণী ইউরোপে গ্রাহ্য হইতে না দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্যজাতিকে মোহগ্রস্ত মনে করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মহাত্মার ব্যথার কথা অবধারণ করিলেও, বস্তুতন্ত্র ক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতি চলে না, এইরূপ বিশ্বাস করেন। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জগতের কাছে দুইটা স্বতন্ত্র ধারা হইয়াই আছে; তাহা যে মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করার জন্যই মহাত্মা যেন আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাষ্ট্র তাঁর জীবনে ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছে; আর তাঁর ধর্ম্মনীতি যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অচল নহে, তাহা আত্মজীবনের দৃষ্টান্তে তিনি পদে পদে প্রমাণ করিতেছেন। যাঁহারা প্রথমে তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক, অনভিজ্ঞের নীতি বলিয়া সমালোচনা করেন, তাঁরাই পরে তাঁর কার্য্যসিদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে কূট-রাজনীতিবিৎ বলিয়া স্বীকার করেন;

আর ভবিষ্যতে যে এ চাল অচল হইবে, ইহাও চীৎকার করিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মহাত্মার অবস্থাটা এখনও পাশ্চাত্যজ্ঞানমুগ্ধ আত্মাস্থাহীন অনেকে অবধারণ করেন নাই। তিনি তো স্বার্থসিদ্ধির চিন্তায় কিছু করিতেছেন না! জগতে বিশ্বাস-বস্তু আজ মলিন, অবজ্ঞাত; সেই বিশ্বাসের জয়ধ্বজা উড়াইতে উড়াইতে তিনি উন্মাদের ন্যায় মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ছুটিয়াছেন। "People talk about a faith they no longer believe in—who will prove this faith and how in an unbelieving world? Faith is proved by action." "বিশ্বাস বলিয়া কথা আছে, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে না; বিশ্বাস-বস্তু প্রমাণ করিবে কে! এই অবিশ্বাসীর জগতে কেমন করিয়াই বা সে প্রমাণ হইবে!" পাশ্চাত্য মনীষির সমস্যা এক কথায় দূর হইয়াছে—মহাত্মার জীবনে। বিশ্বাস স্বপ্রকাশ, ইহা আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। মহাত্মা বিশ্বাসের প্রতীক; তাঁর এই বিশ্বাসই অঘটন সংঘটন করে; তাঁর কাজে যাঁরা diplomacy দেখেন তাঁরা অন্ধ।

রোঁমা রোঁলার আর একটী চমৎকার অনুভূতির কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। বিদেশী যাহা বুঝে, ভারতবাসী তাহা বুঝিবে বলিয়াই আমরা প্রত্যয় করি।

"From the very first, Gandhi and India have formed a pact. They understand each other without words. Gandhi knows what he can demand of India and India is prepared to give whatever Gandhi may demand."

"প্রথম হইতেই ভারতের সহিত গান্ধীর চুক্তি হইয়াছে, মর্ম্মে মর্ম্মে ইহাদের কথা হয়—ভারতের উপর তাঁহার দাবীর কথা তিনি জানেন, আর ভারতও গান্ধীর দাবী পূরণ করিতে সিদ্ধহস্ত।" এমন দেশাত্মপ্রাণ না হইলে কি ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে কেহ পৌরহিত্য করিতে পারে! ভারত-জননী আজ সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

*   *

*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ

কে কাহাকে জয় করে, ভাবিবার কথা! ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা উচ্ছিন্ন করিয়া যে রোমান আদর্শবাদ বর্ত্তমান ইউরোপকে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছে, সে সভ্যতার গোড়া কোথা, আর তাহা কি ভাবে ইউরোপের মাটীতে রূপান্তরিত হইয়া নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিল, তাহার নিগূঢ় রহস্য যদি আমরা অবধারণ করি, তাহা হইলে প্রাচ্যের সম্মুখে যে ধাঁধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা চিরদিনের ন্যায় দূর হইবে।

রোমরাজ্য—প্রতীচ্যের ধর্ম্ম-রাজ্য। রোমরাজ্যের নগরপথে পণ্য-বিপণিশ্রেণীর ন্যায় ভাগবত উপাসনার মন্দির শ্রেণীবদ্ধ। আজ মুসোলিনীর নবীন আদর্শবাদ ইটালীর প্রাণে নূতন সাড়া তুলিলেও, সেণ্ট পিটার ও ভ্যাটিকানের (Vatican) অনুভূতি ও বাণী ইটালীবাসীর আদর্শ তত্ত্ব, কেন্দ্র-লক্ষ্য। প্রকৃতির উদাত্ত সন্তান ইউরোপের অধিবাসী ভাগবত চেতনার সাড়ায় প্রবুদ্ধ হইল, কবে, কি ভাবে!

জুডিয়া, আরব ও মিশর দেশে স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইউরোপের পাশবিক শক্তি মানবসমষ্টি গঠন করিয়া যখন দেশে দেশে দস্যু তস্করের বৃত্তি প্রকাশ করিতেছিল, যখন প্রভুত্ব, আধিপত্যই জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়া এক গোষ্ঠী কর্ত্তৃক অন্য গোষ্ঠীর উচ্ছেদসাধনে, বিদ্বেষে, অনৈক্যে ইউরোপের মানবজাতি শতধাছিন্ন হইয়া ছুটাছুটী করিতেছিল, তখন সুদূর প্রাচ্যভূমি

হইতে যে স্বর্গীয় মুরলিধ্বনি উঠিতেছিল, তাহা তাহাদের নব চৈতন্য-সঞ্চারের যে সহায় হইয়াছিল, সে কথা আজ ধনসম্পদে, বিজ্ঞানে, দর্শনে উদ্বুদ্ধ ইউরোপের মনীষিমণ্ডলীও অস্বীকার করিবেন না। ইউরোপের চিত্তে সেদিনও অর্থ ও রাষ্ট্র ব্যতীত কোন বৃহত্তর বস্তু চক্ষে পড়ে নাই; এমন কি সুসভ্য সমাজসংগঠনেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। অশান্তি ও উপদ্রবে পূর্ণ এই ভূখণ্ডে ধীরে ধীরে ইজিপ্ত ও আবিসিনিয়া হইতে জীবনের অভিনব সঙ্গীত প্রতিধ্বনি তুলিল। রোমের অধিবাসীর সহিত গ্রীসের নিকট-সম্বন্ধ; মিশর, জুডিয়া, আরব দেশের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তাহাদের আসিতে হইয়াছিল; পারস্যের উপকূল হইতে তাহারা বিশ্বের পূর্ব্ব-গগনে যে রবিকরোজ্জ্বল অধ্যাত্ম জাগরণের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার প্রভাব অন্তরে গ্রহণ করিয়া অতি প্রিয় জগতের পথেই উহা প্রবাহিত করার প্রেরণা পাইল। আরবের মরুপ্রান্ত হইতে এই সঙ্গে অমৃতমধুর নূতন রাগিণী ঝঙ্কার তুলিল। প্রাচীন মিশরের হৃদয়-বীণায় তখনও মৃত্যুর পরজীবনের রাগিণী বন্ধ হয় নাই। মানুষের ঐহিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে মরণের পর বিচারের শাসন-বাণীতে সংযত করিতে চাহিতেছে—দেহ-চেতনার বাহিরে ভোগবৃত্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া অতীন্দ্রিয় জগতের সাড়া শুনিবার জন্য আহ্বান-বাণীর ঝঙ্কার তুলিতেছে। সিরিয়া ও পারস্যের অধ্যাত্ম অনুভূতির ঋক্‌ধ্বনি গ্রীস ও রোমের অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জুডিয়া দেশ হইতে নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শ প্রচারিত হইতেছে। গ্রীসের প্রাণ অনুসন্ধানতৎপর হইয়া মাথা তুলিতে চাহিল; ত্যাগ তপস্যার আগুন ইউরোপকে নূতন স্পর্শ দিয়া ঢালিয়া সাজিতে আরম্ভ করিল; সে

অনলের জন্ম বেথিলিয়ন প্রদেশে। অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এক মানবশিশুর রক্তধারায় ধরণী অভিষিক্ত হইল, শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইল, ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদে নিঃস্বার্থচিত্ত হওয়ার আকুলতায় সমাজ গড়িল, রাজ্য গড়িল; শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিতে নূতন শ্রী ফুটিল, মানুষের ললাটে নবারুণ-রাগ রঞ্জিত হইল। দেহ প্রাণের অন্ধশক্তি এতদিন যে কেন্দ্র-ক্ষেত্রের সন্ধান না পাইয়া আত্মঘাতী হইতেছিল, উৎসন্ন যাইতেছিল, ভাগবতবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায়, সেই শতধাবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন মানবপ্রাণ সংহতিবদ্ধ হইয়া নবরাজ্য, নবজাতি গড়িয়া তুলিল। ইউরোপের জাগরণ ধীরে ধীরে অধ্যাত্মচেতনার সাড়ায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রোম তাই এখনও ইউরোপের শিবধাম কাশী, এখনও তাহার মন্দিরে মন্দিরে ভাগবত-স্তুতির ঋক্‌ধ্বনি ইউরোপের আকাশে বাতাসে অমৃত সঞ্চার করে।

রোমের কাঠামো আর গ্রীকের চিন্তা ইউরোপকে সর্ব্বতোভাবে নূতন আকারে গড়িয়া তুলিল; কিন্তু এই নব সঞ্জীবনীধারার গোমুখী উৎসের সন্ধান আজও মিলে নাই। ইউরোপের মনীষিবৃন্দ, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ পৃথিবীর জন্মকথা লইয়া দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান রচনা করিয়াছেন, দেশের পর দেশ জয় করিয়াছেন, কিন্তু জগৎ-সভ্যতার আদি-প্রাণ কোথা হইতে জন্মলাভ করিল, তাহাতে উদাসীন হইয়াছেন—ইহা দুঃখের কথা নহে। ইউরোপের সে সৌভাগ্যের দিন এখনও আসে নাই।

কিন্তু আমরা দেখি, ইউরোপের আদিগুরু প্লেটোর দার্শনিকবাদে ভারতের অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট না হইলেও, ইহার ছায়াপাত রহিয়াছে। ভারতের অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান বুদ্ধিগম্য নহে, ইহা অনুভূতির বস্তু; তাহা না

হইলেও ভারততত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলে সর্ব্বত্র যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, প্লেটোর দার্শনিক মতবাদে অপরিপক্ক ভারতের সনাতন তত্ত্বকেই আমরা তদ্রূপ পরিলক্ষ্য করি।

ইউরোপে ও এসিয়ার অন্যত্র যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার আবেগে মানুষের জ্ঞানোন্মেষ-যুগ, ভারতে তখন সৃষ্টি-তত্ত্বের গবেষণা চলিয়াছে—সে কত যুগযুগান্তরের কথা তাহার ইতিহাস আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের ইতিহাসও বৈদিক ঋক্‌মন্ত্রের ন্যায় আজ ধ্যান ও অনুভূতির সাহায্যেই উপলব্ধি করিতে হয়। পরম জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া ভারত জানিয়াছিল, ইহা জ্ঞানান্তর দ্বারা প্রকাশিত হয় না। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, ভারতবর্ষ জ্ঞানের বিগ্রহ; তাই ইহা জানিতে হইলে, ইহার স্বরূপের সহিত আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হয়। ইহাই ভারতের ত্যাগ ও তপস্যা, আত্মোৎসর্গের মহাযজ্ঞ। ইহা আজ অভারতীয় মনীষিমণ্ডলীও বুঝি ধীরে ধীরে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সৃষ্টির বিশ্লেষণে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তনবাদ লইয়া অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ যখন ভারত সমাপ্ত করিয়াছে, ইউরোপের বিজ্ঞানবাদ তাহার সন্ধান পাইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিল। ভারতের গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি যখন পরিপূর্ণ মাত্রায় মানুষের মন আলোকিত করিয়াছে, ইউরোপ তখন ইহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পাশ্চাত্য গণিতের দুর্ব্বোধ্য রহস্য "maxima" ও "minima" বিশ্লেষিত হইয়াছিল—হিন্দু গণিতজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা। পেরগ্রে, জর্জ্জ বুল এবং বে মরগান মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করেন।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা নিউটনের পূর্ব্বে আচার্য্য ভাস্করদেব উল্লেখ করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞান পরবর্ত্তীযুগের আলোচ্য বিষয়। ভারত সর্ব্বাগ্রে অন্তর্বিজ্ঞানের সাধনায় তন্ময় হইয়াছিল। ভারতে "তত্ত্বমসি"র বিচারে যে সত্যরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহাতেই মানবজগতে যুগান্তর আসিয়াছিল। ভারতের এক একটি অধ্যাত্ম-সূত্র আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্যে অসংখ্য গ্রন্থরাশি রচিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ছন্দ, ব্যাকরণ, বেদান্ত যাঁর আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁর কাছে এই সকল গ্রন্থ যে কত অসম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত, তাহা ধরা পড়ে; কিন্তু আমরা যে আজ আত্মস্থ নহি, আত্মবিশ্বাসের বেদী ভাঙ্গিয়াছে—এ কথা বিশ্বাস করিবে কে?

ভারতের আদর্শ ও সভ্যতার আলোকে বিশ্বজাতি যদি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ভারতের সহিত অভারতীয় জাতির বিরোধ, সংঘর্ষ কোথায়, ভারতের সহিত সংযুক্ত-হৃদয় হইয়া বিদেশিনী নিবেদিতা ইহার স্পষ্ট কারণটী আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারই কথায় আমরা ইহার উত্তর দিব—

"For Rome, the supreme, the invincible has actually been conquered by the ideas of the East. The poor and the lowly have taken her by storm. Henceforth is she to be in Europe not the voice of domination, but of renunciation, not the teacher of aggression, but of self-sacrifice, royal in her rank and her prerogative certainty, but far more deeply and truly the friend of the people than of kings."

অনশনে মহাত্মা

"অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ রোম প্রাচ্যের আদর্শে পরাভূত হইয়াছে, এক নিমিষে সে দীন দরিদ্র প্রাচ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। সে শক্তি আজ যদি ইউরোপের শক্তি হইত, তবে আজ তার কণ্ঠে রাজ্য-শাসন-বাণী উচ্চারিত না হইয়া ত্যাগমন্ত্রের ধ্বনি উঠিত। পররাজ্যাধিকারের গুরু না হইয়া, সে ত্যাগবৈরাগ্যের দেবতা হইত। সাম্রাজ্যেশ্বরী হইয়াও গভীর ও যথার্থভাবে সে প্রজার বন্ধুরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিত।"

ইউরোপের শিক্ষা সভ্যতায় এই ভাব ও আদর্শ ঠাঁই পায় নাই। ইউরোপ ভাগবত বাণী কাণ দিয়া শুনিয়াছে, ভগবানের নামে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যের জন্য জগজ্জয়ে বাহির হইয়াছে কিন্তু ভাগবত চরিত্র সে গড়িয়া তুলে নাই। পক্ষান্তরে ভারতে যে দিব্য-চরিত্রের আদর্শ-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার গবেষণা করিয়াই এ জাতি ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার সাধনায় যুগ যুগ অতিবাহিত করিয়াছে। মানসতন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনটীর মর্ম্ম অবগত হওয়ার জন্য কি কঠোর তপস্যা এ জাতি করিয়াছে, দেহ-যন্ত্রের নাড়ীচক্র-নির্ণয়ের জন্য কত প্রাণ বলি দিয়াছে। এ জাতি চাহিয়াছিল সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান তত্ত্বটীর সম্মুখে সোজাসুজি দাঁড়াইয়া জীবনকে সার্থক করিবে এবং সে অপার্থিব বস্তুর সন্ধান যে না করিয়াছে, তাহা নহে; সেই অনুভূতির বাণীই তার দর্শনে, পুরাণে, জ্যোতিষে, শব্দ-শাস্ত্রে, স্বাস্থ্যে, সমাজে, শিক্ষায়, সাধনায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য রাষ্ট্রকর্ম্মে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়া মহাত্মার মুখে যখন বাহির হইল "আমি আত্মোপলব্ধি করিতেই বাহির হইয়াছি, আমি ভগবানের সম্মুখে মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইতে চাই; আমার লক্ষ্য মোক্ষ,

ভাগবত-লাভ, আর ইহার বিধান অন্য কিছু নহে, তপস্যা ও আত্মোৎসর্গ," তখন বুঝা গেল, সত্যই ভারতীয় সভ্যতার বীজমূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধী; আর প্রাচ্যের দীক্ষা পাইয়াও যে ইউরোপ মদগর্ব্বে আজ আত্মবিস্মৃত, তাহার যুগোপযোগী চৈতন্যসঞ্চারের জন্যই তাঁর আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবির্ভাব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ এই ভোগবাদ ও ত্যাগবাদের আদর্শ লইয়া। পৃথিবীতে খৃষ্টানের সংখ্যা পঁয়ষট্টি কোটী বলিয়া ইউরোপের যে গর্ব্ব, তাহার ভিত্তি বালু-রাশির উপর। যে মিশর ও জুডিয়া প্রদেশ হইতে সভ্যতার উৎস-ধারা প্রতীচ্যকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, সে মিশরের ও জুডিয়াপ্রদেশের সভ্যতা ও আদর্শের বনীয়াদ আজ মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করিতে হয়; তাহার কারণ আর অন্য কিছু নয়, তাহারা জগৎকে যাহা দিবার তাহা দিয়াই নিজেদের নিঃশেষ করিয়াছে। ইংলণ্ডের দানও নিজস্ব বস্তু নহে, সেও ইহা প্রাচ্যের নিকট হইতে পাইয়াছে; তাহার একটা দেওয়ার অধিকার আছে, সে অধিকার শেষ হইলে তাহাকেও নিঃশেষ হইতে হইবে। মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও সভ্যতা থাকে না ভৌগলিক বিধানে, বিভিন্ন রীতি নীতির মধ্যে; মানবাত্মার জয়যাত্রা একই পথে চালিত হয়, ভারত তার আদি নিয়ামক। সে কোটী কোটী বৎসরের তপস্যায় যে অমৃত-বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিয়াছিল, তাহার বাহন-স্বরূপ প্রাচ্যের প্রতিবাসী জাতি-মণ্ডলীর দুয়ারে তাহা পৌঁছাইয়া দিয়া কর্ম্ম শেষ করিয়াছে; কিন্তু ভারতে যে মহাদানের ভাণ্ডার সুপ্রতিষ্ঠিত তাহাকে কোন যুগে নীরব থাকিলে তো চলিবে না। এই আত্মবিশ্বাসের হোমকুণ্ড যখনই নির্ব্বাপিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখনই তো ভারতে মহাপুরুষের

আবির্ভাব ঘটে। আজ চতুর্দ্দিকে জয়-ঘণ্টা রবে আসমুদ্রহিমাচল মন্দ্রিত, তাহার কারণ ইহা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে!

প্রাচ্যের দুর্দ্দিন—পরাধীনতার শৃঙ্খল তাহার গলে পড়িয়াছে, ইহাই নহে; দুর্দ্দিন—সে আজ স্বার্থ-দৃষ্টিবশতঃ আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। মিশরের রাজা ফাউদ সেদিন বলিলেন—মিশর আজ প্রাচ্য আদর্শের অনুরাগী নয়, তাহারা মুখ ফিরাইয়াছে পাশ্চাত্যের অভিমুখে। এই কথা মিশরের গৌরব-বাণী নহে। কামালও কার্য্য-সৌকর্য্যে স্বধর্ম্মের সংস্কারসাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রাচ্যের সর্ব্বত্রপ্রতীচ্যের জয়-গৌরবে মুখরিত; ভারতে কিন্তু আজ বিরোধের সুর। ইহা কি তুচ্ছ স্বার্থপরতার জঘন্য হিংসাবৃত্তি? না, ভারতের তাহা ধর্ম্ম নহে। ভারতের শিরায় শিরায় অতীতের যে শাশ্বত গৌরবময় মহান্ আভিজাত্য ও আদর্শবাদের রুধিরধারা আজও বহমান, তাহা রুদ্ধ হইবার নহে। বিলাতের আধুনিক চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে বার্ণাড শ' একজন; রবীন্দ্রনাথকে তিনিও সদম্ভে বলিয়াছিলেন, "যদি প্রাচ্যের আদর্শবাদ মানবমুক্তির অন্তরায় হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতীচ্যের আদর্শ বরণ করিতে হইবে। আজ আদর্শ-প্রবাহের মূল কেন্দ্র-তীর্থ মানুষ আর অন্বেষণে প্রবৃত্ত নহে; অধিকারিবাদের তারতম্যে যে যতটুকু পাইয়াছে, তাহা লইয়াই সে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। ইউরোপের শৌর্য্য ও প্রতাপের সম্মুখে পৃথিবীর সকল জাতিই আজ বিভ্রান্ত। ভারতও এই শতবর্ষে ইউরোপের আদর্শে আপনাকে ভুলিতে বসিয়াছে; কিন্তু চীন, জাপান, তুরস্ক, পারস্য যাহা পারে, ভারতের তাহাতে যে অধিকার নাই। সে যদি আত্মবিস্মৃত হয়, গগনের সূর্য্যপতনে পৃথিবী অন্ধকারময় হওয়ার ন্যায় বিশ্ব যে আবার অবর স্তরে প্রবেশ করিবে।

ভারতকে তাই আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই দর্পান্ধ কবন্ধের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। সে সংগ্রাম হিংসার অস্ত্র লইয়া আরম্ভ করিলে, ভারতের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব রক্ষিত হইবে না—প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য ভারতীয় চরিত্র প্রকাশ করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সহিত সংগ্রাম করার যে নীতি পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রভাবে লাভ করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করার গুরুতর দাবী মহাত্মার বাণীর ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পাইল। অন্ধ জাতির কাণে ইহা হিত-বাণী শুনাইবে না; কিন্তু তিনি ভারতেরই বাণী প্রচার করিতে শতমুখ হইলেন।

শতবর্ষের ভারত অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইল। তাহারা আত্মসংবিৎ মহাত্মার বাণী শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি সগর্ব্বে বলিলেন—আমি হিন্দু, ভারত হিন্দুজাতির দেশ; কিন্তু হিন্দুজাতি বলিতে এমন যদি বুঝায়, যে তাহাদের বেদ ভিন্ন অন্য ভাগবত গ্রন্থে বিশ্বাস নাই, সে কূপমণ্ডুক হিন্দু সনাতন-ধর্ম্মী নহে। হিন্দু বেদবিশ্বাসী; বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা বেদের ন্যায়ই ভাগবতবাণীময়। হিন্দুত্ব কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকের অন্যকে ধর্ম্মান্তর করার যুক্তি নহে, অস্ত্র নহে; হিন্দুত্ব ভূমার ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, সকলের চরণে অর্ঘ্য দিবার মন্দির হিন্দুই গড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মই শিখাইয়াছে, "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে"—যে যাহার বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবানকে আরাধনা করিবে। তাই হিন্দুধর্ম্ম সমন্বয়ে যত্নবান্—ইহাই ভারতের সেই নিত্য, সার্ব্বভৌম, সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী।

তথাকথিত রাষ্ট্র-নেতার ন্যায় মহাত্মা ভাবমুখেই হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই; তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন বিধান পালন করিয়াই

হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি হিন্দুর বেদ, উপনিষদ্, পুরাণে বিশ্বাস করেন—কাজেই পরলোকে বিশ্বাসী। তিনি ভারতের বৈদিক বর্ণাশ্রম অস্বীকার করেন না, লৌকিক বা সামাজিক স্বার্থপরতন্ত্র বর্ণাশ্রম তাঁর নিকট স্বীকারের বিষয় নহে। গো-জাতির রক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া তিনি স্বীকার করেন, ভারতের প্রতীকোপাসনাও তিনি অবজ্ঞা করেন না। হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক নীতিগুলি আন্তরিকভাবে মান্য করিয়াই তিনি হিন্দুর অমর-বীর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন।

ভারতের বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে, তাঁহারা অনেকেই এতদিন নির্ব্বিবাদে হিন্দুধর্ম্মের মুণ্ডপাত করিয়া, ভূমার নামে বিশ্বের বাজারে আত্মবিক্রয় করিয়া নবযুগের আলোরূপে সগর্ব্বে সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের বিশ কোটী নরনারীর দিকে করুণাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; মহাত্মাকে দেখিয়া তাঁহাদের চমক হইল।

রামমোহন রায়ের বাংলা চক্ষে অন্ধকার দেখিল, রামকৃষ্ণের দেশ আলোকিত হইল। হিন্দু বলিতে যাঁহারা এতদিন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহারা হিন্দু নামের সার্থকতা বুঝিলেন। আমরা সভয়েই বলিব—রোমকে যেমন একদিন ভারতের ধর্ম্ম ছদ্মবেশে, দীন মূর্ত্তিতে ভাগবত ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিল, বৃটেন তেমনই বীর বেশে সদম্ভে ভারতের প্রাণে ইউরোপের ভোগবাদের অঙ্কুর বপন করিয়াছে। ভারতের আত্মা এতদিন উত্তেজনাপূর্ণ উগ্র মদিরাপানে যেন বিভোর হইয়া জড় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদিও বিবেকানন্দের ভীম গর্জ্জনে তাহার চমক ভাঙ্গিল, কিন্তু বাণীর বীর্য্য মানুষকে কতক্ষণ আত্মস্থ রাখিতে পারে! স্বামীজী ছিলেন মন্ত্রময় ঋষি, মহাত্মা মন্ত্রের আচার

দান করিয়া জাতিকে রক্ষা করিলেন। ভারতের উত্তরে চিরযুগ আমরা ঋষির অভ্যুদয় দেখিয়াছি; ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য দক্ষিণ ভারতেই অধিকাংশ জন্ম লইয়াছেন। মন্ত্র নিস্ফল, যদি ইহার সাধন-বিজ্ঞান না মিলে। মহাত্মা হিন্দু-বীর্য্যের স্ফূরণ, জাগরণ সিদ্ধ করিয়া সিংহ-গর্জ্জনে ভারতের জয় ঘোষণা করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রে ধর্ম্ম এতদিন শুধু কথা ছিল; বাংলায় রাষ্ট্র-সাধনার ছন্দে ভারতীয় সুর প্রবেশ করে নাই—মহাত্মা তাহার প্রবর্ত্তন করিলেন।

হিন্দু-ধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিয়াছিল—দার্শনিকতার কুহকে। দর্শন-শাস্ত্রের মত হিন্দু-ভারত মস্তিষ্ক-বৃত্তি রূপেই ইহাকে ধারণ করিয়াছিল; বিশেষতঃ বাংলায় রাজা রামমোহনের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম যেন অধ্যাত্ম-বিলাস-বস্তু-রূপেই নিবীর্য্য ছিল, ইহার আচার ছিল না। যেখানে আচার পরিদৃষ্ট হইত, সেখানে লক্ষ্য স্থির ছিল না; আচারপরায়ণ ব্যক্তি ভূত-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় অধিক পঙ্গু বলিয়া মনে হইত। যে চরিত্র হিন্দু-চরিত্র, তাহা এ পর্য্যন্ত আমাদের লক্ষ্যে পড়ে নাই; মহাত্মা সে সমস্যা দূর করিলেন। সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি হিন্দুর যে সনাতন আচার, তাহা সিদ্ধ করিলে যে ধর্ম্মের অমর বীর্য্য লাভ হয়, তাহা ভাষায় নয়, কার্য্যে, জীবনে প্রমাণিত হইল।

মহাত্মার কণ্ঠের রাম-নাম আবার আমাদের অযোধ্যার স্বপ্ন সার্থক করিল। গীতা-মাহাত্ম্যে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুরকে জাগাইয়া তুলিল। ত্যাগ তপস্যার প্রভাবে পাটলিপুত্র উজ্জয়িনীর স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণায় ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের পবিত্র ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। ভজন উপাসনার মন্ত্রে কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, অমরাবতী

জড় মৃত্তিকাময় না হইয়া ভক্তির গঙ্গোত্রীধারা উৎসরিত করিল। আজ মহাভারত আমাদের সম্মুখে, ভারতের ভবিষ্য-সন্তানের হৃদয়ে উৎসাহের অনল উদ্দীপিত, ব্যাস বাল্মীকির ন্যায় কবি, ভীষ্ম পার্থের ন্যায় বীর, জনক অজাতশত্রুর ন্যায় নৃপতি, শুক সনৎকুমারের ন্যায় সন্ন্যাসী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর যেন স্বপ্ন মনে হয় না। হিন্দুস্থান যে যাদুকরের মোহন মুরলী-ধ্বনিতে নূতন জন্ম লইতে জাগিয়া উঠিল, প্রাচ্যের সে জন্মদাতা মহাপুরুষ কেবল ইউরোপের বিরুদ্ধে মাথা তুলেন নাই, ভাগবত-বিশ্বাসহীন জাতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। এ সংগ্রামের অস্ত্র পশুবল নহে, আত্মদান—"self-sacrifice ;" এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশে মহাত্মাকে যীশুর সহিত তুলনা করা হয়। মানুষের অন্তরে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের বাণী প্রচার করিতে আসিয়া, যীশুখৃষ্ট তাঁহারই স্বজাতি কর্ত্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ "ক্রুশ" নাই ; কিন্তু আত্মদানের মরণবেদী ঘুচে নাই। কে জানে, এ যুগের যুগপুরুষকে তিলে তিলে মৃত্যুই বরণ করিয়া লইতে হইবে কিনা! তবে ধন্য ভারতবাসী—জুডিয়ার যুগ-পুরুষকে জু-জাতি স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল আজ যাঁর উপাসনা-মন্ত্রে মুখরিত, আত্মোৎসর্গ-যজ্ঞে বলির রক্তে লাঞ্ছিত না করিয়া আজ সেই দেবতার সঙ্গে ভারতের নরনারী নবজন্ম লাভ করিতে উদ্যত। মহাত্মার বাণী ভারতের সনাতন বাণী, "...I believe absolutely that India has a mission for the world". বিশ্বের জন্যই ভারতের জাগরণ। ভারতের সঙ্কল্প হউক, যে অভাগবত শিক্ষা সভ্যতায় আমরা অন্তর্য্যামী হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছি, ঈশ্বরচেতনা-বিযুক্ত হইয়া ভোগ জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া ঐশ্বর্য্যের সেবায় আত্মহারা হইতেছি, যেন তাহা হইতে

বিরত হইয়া আবার মন্ত্রসিদ্ধ করিতে পারি—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃকস্যচিদ্ধনম্।"

মহাত্মার তপস্যা ও আত্মানুভূতি মহাত্মার মুখ হইতেই আমরা শুনি। তিনি যাহা কিছু করেন তাহা ভাগবত অনুভূতি লাভের জন্য। গীতার সেই মহাবাণী—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥"

'হে কুন্তীনন্দন, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সবই আমায় অর্পণ কর।'

ভারতে নিজের বলিতে কিছু রাখিতে নাই; ভারতে যাহার জন্ম তাহার জীবনের শিক্ষা ও সভ্যতা এবং আদর্শের অব্যর্থ চিত্র যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের তীর্থে, মন্দিরে, শাস্ত্রে, গ্রন্থে, ভাষায়, ভাবে সুপরিস্ফুট। রামপ্রসাদের গানে গীতার বাণীই প্রচারিত হইয়াছে—

"আহার কর মনে কর আহুতি দাও শ্যামা মারে
নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে"

ভারতের এই ভাগবত চেতনা জাগ্রত রাখিয়া কর্ম্ম করার অধিকার মানুষকে দেওয়া হইয়াছে; অহঙ্কার ও কামনাকে পুষ্ট করিয়া যে রাজভোগ তাহা তুচ্ছ করিয়াই ভারতের নর নারী সৃষ্টির পরম কারণের অন্বেষণে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিল। কোটী যুগের তপস্যায় ভারত বুঝিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অভিষিক্ত হওয়ার উপায়—ভগবানে দেহ মনের

চেতনা তুলিয়া দেওয়া। সারা জীবনটাই তাহার তপস্যা ; ভারতের মানুষ বর্ণমালা শিক্ষা করিতে গিয়া "ক" অক্ষর দেখিয়া কাঁদিয়া সারা হয়, ইহা যে তার ইষ্ট-স্বরূপ লক্ষ্যকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার প্রথম শব্দ ; সে অক্ষর শিখিতে গিয়া তাহার নাদ বিন্দু, প্রভৃতি শব্দ-সাধনার কৌশল ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করে। সে প্রতিদিন প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলে—'তোমার প্রীতির জন্য আমার এই সংসার-যাত্রা। তোমার নির্দ্দেশ আমার জীবন, আয়ুঃ, আমার গৃহ পরিবার। আমি শয়ন করিয়া তোমায় প্রণাম করি, নিদ্রায় তোমারই ধ্যানে তন্ময় হই, জীবনের এমন অবকাশ রাখি না যে ফাঁকে তোমায় হারাই।' ভারতের এই যে ভাগবত আদর্শ, তাহা আজ গেল কোথায়? আজ যে শিক্ষা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভারতসন্তান ভাবিতে শিখে—তাহার ভবিষ্য-জীবনের সুখসম্পত্তির কথা ; সে যে চিত্তের পরতে পরতে আঁকিয়া তুলে তার সমুচ্চ প্রাসাদ, ধনরত্ন-খচিত বিলাসপুরী, অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী! ভোগের পঙ্ক অঙ্গে মাখিবার মনোবৃত্তি শিক্ষার ভিতর দিয়া যে জাতি আহরণ করে, তার পরিণামে বর্ত্তমান জগতের রাক্ষসী সভ্যতা ছাড়া আর কি মূর্ত্ত হইবে? মহাত্মা এই শিক্ষার স্রোতেই তো ভাসিয়াছিলেন ; বিদ্যালয় হইতেই তো শিখিয়াছিলেন—রসনার তৃপ্তিতে জীবনের জয় আছে, ভোগপ্রবৃত্তিতে সুখ আছে। কিন্তু হাজার হাজার ভারতের শিক্ষার্থী যেমন বিকৃত আদর্শে আর্য্যভূমিকে কলঙ্কিত করিতেছে, কেন তিনি তাহার অন্যথা করিলেন? কেন তিনি আঘাতে আঘাতে অনুতপ্ত হইয়া সত্য আশ্রয় করিলেন? কেন তাঁর ভোগক্ষেত্রে তরল তারুণ্য স্থবির বার্দ্ধক্যে পরিণত হইল? কে বলিবে, ইহার নিগূঢ় রহস্যের কথা!

কিন্তু আমরা দেখি, মহাত্মার প্রসূতি প্রতিদিন যে ধর্ম্মপ্রাণ লইয়া কঠোর তপস্যায় পুত্রের সম্মুখে পবিত্র ঘৃত প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়া বর্ত্তমান ছিলেন, পিতার সত্য নিষ্ঠা, রামায়ণ ভাগবত পাঠে অনুরাগ, তাহা অলক্ষ্যে তাঁহাদের সন্তানের প্রাণে জন্মগত অধিকারকেই জাগাইয়া তুলিতেছিল। অনুকূল বাতাসে সে ছাই-ঢাকা আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভারতের মর্ম্ম যেখানে মলিন অস্পষ্ট, সেখানে আর আশা নাই; যে গৃহ আজ আশ্রমের পুণ্য-প্রভাব-বর্জ্জিত বিলাস ও ভোগপঙ্কে কলঙ্কিত, সেখানে আর ভারতের পুত্র-কন্যাকে গড়িয়া উঠিতে দেখিবে না; সেখানে অসুর-মূর্ত্তির গঠন আরম্ভ হইয়াছে। যীশুর রক্তচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া যদি পাশ্চাত্যের জয়যাত্রা হইত, তবে ভারত তাহা বরণ করিয়া লইতে আপত্তি করিত না; কিন্তু এ জয় তো আত্মজয় নয়, এ জয় দুর্ব্বলের উপর পশুবলের অত্যাচার। এ জয় পৃথিবীর বক্ষ ছানিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন, আত্মবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অসংযত জীবনের একটা উদ্দাম, উচ্ছ্বাস। ইহার গর্জ্জন ভীষণ, অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ইহার পরিণাম। কিন্তু আজ আপাতসুখের :মোহ ক্ষুদ্র-হিয়া জগতের নর-নারীকে পরমাত্মা হইতে বিমুখ করিয়াছে, দেহ ভোগের লালসায় আমরা প্রবঞ্চিত হইতেছি। ভারত এই স্বভাব-গতির বিপরীত যাত্রার অস্ত্র-স্বরূপ ত্যাগ ও তপস্যার নীতি সঙ্গে লইয়াছিল। দেহেন্দ্রিয়ের সংযম, তপস্যার আচার, শয্যাসঙ্গত্যাগের জন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান হিন্দু-জীবনের বিধান; উপাসনা-মন্ত্রে সারাদিনের জীবনের সুর বাঁধিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের পথে অগ্রসর হওয়া হিন্দু-ভারতের লক্ষ্য। রসনার তৃপ্তি আহারের উদ্দেশ্য নয়; দেহধারণ ও পুষ্টি, ভাগবতানুভূতি-বহনের যোগ্য করার জন্যই ভোজনাদি

ব্যাপার; শিশু-চাপল্য দূর করার জন্য কৈশোরে দ্বিজত্বের দীক্ষা, উপনয়ন; শিক্ষাক্ষেত্র গুরুগৃহে, আত্মসংবিৎ জাগাইতে গিয়া শিক্ষার বিধান—ব্রহ্মচর্য্য। গার্হস্থ্য-জীবন ভূমার আনন্দাস্বাদনের সাধনা; আত্মাকে নিজের মধ্যে অপরের মধ্যে সন্দর্শন করার ইহা যজ্ঞক্ষেত্র। আত্মদর্শনে প্রবুদ্ধ যোগী, জগদ্ধিতায়, বহুজন-হিতায় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—হায় ভারতের প্রাণ, তোমার সে কৃতযুগের দিব্যাচার, ভাগবত ধর্ম্ম কোথায় হারাইলে!

প্রাচীন বটের তলে পুষ্পদলশোভিত একখণ্ড প্রস্তর, পথের ধারে তুলসী-মঞ্চ, অপরাজিতা, টগর, কামিনী ফুলের কুঞ্জে সিন্দুরলিপ্ত ষষ্ঠী ঠাকুর! দিব্য ভাব ও কল্পনার স্তরচিহ্ন ভারতের অসংখ্য দেব-দেবী—এ যে "যেদিকে ফিরাই আঁখি তোমারে দেখিতে পাই!" সে আমার দেবতার ঘর কে ভাঙ্গিয়া দিল! দোষ দাও কোন বুদ্ধির প্ররোচনায়, ভারতীয় বুদ্ধিকে! এতো ভারতীয় বুদ্ধির দ্যোতনা নয়। অগ্নি-পূজক যদি ধূমকে বাদ দিয়া অনলের সন্ধান করে, তবে তাকে বঞ্চিত হইতে হয়। ভারতের চেতনায় অভাগবত তো কিছু নাই, তৃণ-গুচ্ছকেও যে সে মৃতপাত্রে মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া রোপণ করে, নবাঙ্কুরের দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলী দেয়। সর্ব্বভূতে নারায়ণ-দর্শন করার প্রতি স্তররক্ষার এই আয়োজন মূর্খতার নিদর্শন ছিল না। যে বালক আজ বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য, পথের ধারে 'পঞ্চানন্দের ঘোড়ার' কাছে প্রার্থনা জানাইয়া নতশির হয়, তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলে কি হইবে! সাধনার প্রথম স্তর যে বিশ্বাস; তাহার গঠন-নীতি আজ ভাঙ্গিয়া দাও কেন? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্লাবনে ভারতের এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে তাই বটের মূলে এখনও মানুষ মাথা

ঠুকিয়া মরে, বিল্ববৃক্ষমূলে গিয়া চক্ষু মুদিয়া বসে, আর জড় প্রস্তর-মূর্ত্তির সম্মুখে জোড় করে বলে—মা ভক্তি থাকিলে, তুমি অনলে, অনিলে, জলে, স্থলে, মৃত্তিকা-প্রতিমায় জাগ্রত হও—দাও মা, আমায় সেই শ্রদ্ধা-ভক্তিটুকু দাও! এই ভারতের সাধনার বেদী তাই আর ভাঙ্গা গেল না।

মহাত্মা তাই সত্যই বলিয়াছেন—"I have realised [that my salvation could lie only in Hinduism." হিন্দুই যে মহাভারত গড়ার পথে উদ্যোগী হইয়াছিল, সে যীশুর ছবি উপাসনার মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিল, পীরের দরগায় সিন্নি দিতে ছুটিয়াছিল—কোথাও যে ইষ্ট সঙ্কীর্ণ, শূন্য, ইহা যে সে ধারণা করিতে পারে না! এই ভূমার অনুভূতি ও উপাসনার দেশ ভারতবর্ষ; দেবজন্মলাভের প্রসূতি ভারতবর্ষ। কোটি জন্মের তপস্যায়, মানুষের ভোগক্ষয়ে এখানে জন্ম হয়; এই পবিত্র জীবনের মাহাত্ম্যরক্ষায় ভগবান যুগে যুগে যদি অবতীর্ণ না হন, মায়া-মূঢ় মানুষ ভাব রক্ষা করিবে কেমন করিয়া—বিশ্বাস যে মলিন হইবে! এই ভারত—যেখানে দাঁড়াইয়া মহাত্মার কণ্ঠে জলদ-গর্জ্জন উঠে—"My patriotism is subservient to my religion. I cling to India like a child to its mother's breast, because I feel that She gives me the spiritual nourishment I need. If She were to fail me, I would feel like an orphan, without hope of ever finding a guardian. Then the snowy altitudes of the Himalayas must give what rest they can to my bleeding soul." ইহার মর্ম্মার্থ পাঠকদের কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য করিতে

বলি না ; আজ আমরা বড় প্রখর বুদ্ধিজীবী হইয়াছি, হৃদয় হারাইয়াছি ; কথাগুলি হৃদয়গ্রাহ্য কর—দেখ, ইহার মধ্যে সাধনার কি নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে !

"আমার দেশ-প্রীতি আমার ধর্ম্মসাধনারই অনুগামী। ক্ষুদ্র শিশু যেমন মায়ের অঙ্ক আঁকড়াইয়া থাকে, অমিও সেইরূপ ভারতকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি ; কেননা, আমি জানি, মায়ের স্তন্য-দুগ্ধেই আমার অধ্যাত্মজীবন পুষ্ট হইবে ; তিনি যদি ইহাতে অসমর্থ হন, আমি পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুর ন্যায় অনাদৃত হইয়াই থাকিব, অন্য অভিভাবকের সন্ধান করিব না, ঐরূপ আশাও রাখিব না। তখন ঐ তুষারমণ্ডিত গগনচুম্বী হিমালয়ের শৃঙ্গে আমার রক্তাক্ত আত্মা যেটুকু শান্তি পায়, তাহাই আমার সম্বল হইবে।"

হিন্দু-ভারতের যে প্রথম শিক্ষা, যাহা সর্ব্বপ্রথম সাধ্য, সেই বিশ্বাস ও নিষ্ঠার কথাই এই ক্ষেত্রে উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই যেদিন কলিকাতায় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আসিয়া মহাত্মা শুনিলেন—হিন্দুধর্ম্মে পাপের ক্ষমা নাই, নরক আছে, সেইজন্য তিনি খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন ; প্রার্থনা করিলে, তাঁর আশ্রয় লইলে পরম পিতা ক্ষমা করিবেন। তিনি এই হিন্দু-ব্রাহ্মণের দুরবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। গীতার সেই অভয়বাণী কি ইঁহার কর্ণগোচর হয় নাই ? খৃষ্টের এই বাণী যে গীতারই অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

শুধু কি এই কথা, ভারতের ঠাকুর গীতার ছত্রে ছত্রে মানুষকে 'অভয়

দিয়া, তাঁর চরণে আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন—ইহা যে খৃষ্ট জন্মিবার আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা—হা বিধাতা!

ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ ভারতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিয়াছে; কিন্তু তাহা যে বুদ্ধির ধর্ম্ম, হিন্দুকে যে এই সকল আন্দোলনে অনাচারী করিল—গুরু, শাস্ত্র, দেবমন্দির, ভারতের তীর্থ, এই সকলে বিজাতীয় ঘৃণা করাইতে শিখাইল! বুদ্ধি-বস্তুটা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সভ্যতায় একেবারে ম্লান হওয়ায়, এইরূপ উদ্দাম-নীতি অস্বাভাবিক নয়। রোঁমা রোঁলাকে সত্যই আমরা ভূয়সী প্রশংসা করি। তিনি ভারতের মর্ম্ম এমন করিয়া বুঝিয়াছেন, যাহা শিক্ষিত হিন্দুভারত বুঝি বোধগম্য করিবে না। ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব আমরা বুদ্ধির মাপকাটীর মধ্যে আনিতে চাহিতেছি; দেশের ঋষিকল্প রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তিনি বলেন— "Gandhi is a universalist through his religious feeling; Tagore is intellectually universal."

"মহাত্মার ভূমার চেতনা ধর্ম্মানুভূতির ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে; ঠাকুর বুদ্ধির সাহায্যে সেই চেতনায় অধিরোহণ করিয়াছেন।" এই প্রতিভার মূল্য কম নয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে এখনও বুদ্ধির প্রদীপ জ্বালাইয়া যাঁহারা এই জাতিটাকে আলো দিয়াছেন, ভারতধর্ম্মে অনুরক্ত করিতেছেন, তাঁহাদের চরণে আমাদের অসংখ্য প্রণতি। শত বৎসরের বাংলায় ইউরোপের অনুকরণে ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে গিয়া আমরা চার্চ্চ গড়িয়াছি, বিশ্বনাথের মন্দিরে নূতন প্রাণ আনি নাই, কলিকাতার কালীমন্দিরের সংস্কার করি নাই, গয়ায় গদাধরের পূজায় জীবন্ত ঋকধ্বনি তুলি নাই; অথচ এইখানেই আমাদের কোটি কোটি ভারতধর্ম্মী মাথা খুঁড়িয়া

মরে। এই ভক্তি, নিষ্ঠা, বিশ্বাসের বেদী যদি ধর্ম্মসংস্কারকগণ রাখিতেন, ভারত আজ ভারত হইয়া দাঁড়াইত। মহাত্মার সে কাজ নয়; তিনি কেবল দেখাইলেন, ধর্ম্ম বুদ্ধির বস্তু নয়, দেহ, মন অন্তরের বস্তু; জীবনটাই ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মের আচার সবখানি দিয়া, সর্ব্বকর্ম্মে।

ধর্ম্মের ভার বুদ্ধিতে বহিয়া আমাদের প্রতিভা বাড়িয়াছে, আমাদের অমৃতময় করে নাই; আমাদের মন, দেহ দিব্য করিয়া গড়ে নাই, হৃদয় হইতে সংশয় ও পাপের ছায়া ঘুচে নাই। বিচার-বুদ্ধির কসরতে আমরা ভারতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছি; ইহা অধিক দিন হইলে ধর্ম্ম-প্রাণ, ধর্ম্মের সুদৃঢ় দেহ গড়িয়া উঠিবে না।

এই যে আমাদের সম্মুখে, মহাত্মার সম্মুখে আজ ভারতের মহিমারক্ষায় একে একে ভারতের সর্ব্বত্যাগী সন্তান মাথা তুলিলেন, কালগর্ভে লীন হইলেন, কেহ বা তপস্যার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন, ইহার অর্থ অন্য কিছু নহে—দেহ ও মনের কৃচ্ছ্রতা ইঁহারা সহিতে অসমর্থ। দেহ মনকে সুস্থ রাখিয়া ধর্ম্মানুশীলন-প্রবৃত্তি বৌদ্ধযুগ হইতে এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা হিন্দু-আত্মার স্বধর্ম্ম নহে। হিন্দু-আত্মা নিরন্তর গতিশীল—আট বৎসর বয়স হইতে শঙ্কর দেশ দেশান্তরে ছুটিয়াছেন; নিমাই পায়ে হাঁটিয়া বাংলা, উড়িষ্যা, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন; ঠাকুরের কণ্ঠে রক্ত ঝরিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মটাই হইতেছে গতিপ্রাণ "aggressive।" ভগ্নী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছিলেন—"Aggression is to be the dominant characteristic of India, aggression and the thought and ideas of aggression, instead of passivity, activity." অর্থাৎ "ভারতধর্ম্মের মূল লক্ষণ আজ হউক গতিশীল ভাব ও

চিন্তা—শান্ত সমাহিত অবস্থা নয়, কিন্তু উদ্যত প্রাণ মহাবীর্য্যই আশ্রয় কর।"

শক্তি-প্রয়োগে "মহাশক্তিই জাগে। মহাশক্তি জাগিলেই আত্মোপলব্ধি হয়—কোন ক্ষেত্র বিশেষ দিয়া নহে, সমস্ত জীবনে। আত্মার জাগরণে দেহে তপস্যা, হৃদয়ে ভক্তি, বুদ্ধিতে জ্ঞানালোক বর্ষিত হয়। এই ভারতে তাই যোগিশ্রেষ্ঠ জনক পৃথিবীর অধিপতি; এই ভারতে তাই শুক পথের ভিখারী, ভাগবতধর্ম্মী—ভারতবাসীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া মরে; তাই ভারতে নগ্ন পদ, শীর্ণমূর্ত্তি, রুক্ষজটাভার রুদ্রকে স্বর্ণসিংহাসনে উঠাইয়া বসান হইত। ভারতের অধ্যাত্মশক্তি বুদ্ধিগত হওয়ায়, আমরা বিগত শতাব্দীতে ধর্ম্মের বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারি নাই; পরাজয়ের নয়, তবুও পরাজয় স্বীকার করিয়াছি। মহাত্মা জয়ের পর জয় লাভ করিতেছেন—ধর্ম্মের গৌরবই বাড়িতেছে। অধ্যাত্মশক্তি জগতের পশু-বলের অপেক্ষা কত কোটী গুণ অধিক, তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চাহেন; সে প্রমাণ প্রতি পদে হইতেছে। ধর্ম্মে অনাস্থা দূর করার এই অমোঘ বিধান এমন করিয়া আর কেহ তো দেয় নাই! চিত্তরঞ্জনের সে তপস্যা ছিল না; নেহেরুর সে দেহ, প্রাণ, মন গড়িয়া উঠে নাই, ভারতের তরুণও মরণ-আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু এই ধুর্জ্জটী, বয়োবৃদ্ধ নেতা এত ক্লেশ বহেন কেমন করিয়া! হিন্দুধর্ম্ম তো কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু নয়, কেবল অনুভূতির সামগ্রী নয়; ইহাতে লয় হওয়ার কিছু নয়—ধর্ম্ম তো আমা হইতে অন্য কিছু নহে, যে আমি অন্যে ডুবিয়া নিঃশেষ হইব, অথবা ডুবিয়া থাকিব। এই বোধই ইংরাজীতে বলিব, Conceptual অর্থাৎ কাল্পনিক। ভারতে এই কাল্পনিক ধর্ম্মেরই যুগ চলিতেছিল। ধর্ম্ম যে সাধনার বস্তু,

আর সে স্বয়ং প্রকাশমান, ইহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হায় ভারতবাসী, আজ এই নগ্ন, জন্ম-তপস্বী, সর্ব্বক্লেশক্ষম ক্ষুদ্র মানুষটীকে দেখিয়া তোমার আচারও যে সনাতন, তোমার জীবনধারণের' জন্য ভোজন, উপবেশন, শয়ন, সবই যে শাস্ত্রনির্দ্দেশে অনুশাসিত, ইহা কি বিশ্বাস করিবে? ধর্ম্মের আকার আজ মহাত্মার জীবনদৃষ্টান্তে পরিদৃষ্ট হয়, বাক্যে নয়, কর্ম্মে—অগ্নিপরীক্ষায় আজ তাঁর এই দেয় জাতিকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।

তিনি ভারতের কোন গ্রন্থ, কোন ভাব, কোন আদর্শ অনুশীলন করার সুযোগ পান নাই। যৌবনের প্রথম প্রভাতেই বরং ভোগের ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু একটী মন্ত্র তাঁকে ভারতীয় সাধনার সবখানি বীর্য্য দিয়াছে। হিন্দু-ভারতের এইখানে যে কি মাহাত্ম্য আছে, যাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, বিক্রীত হইয়াছে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, তাহাদের ইহা বুঝান যাইবে না। এইখানে হিন্দু-ভারতকে বলিয়া রাখি, ইংরাজী transcend করার অর্থ হইয়াছে—অতিক্রম করা, অর্থাৎ আজিকার যে ভাব, যে বাণী, যে মন্ত্র, তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। গীতার বাণী উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করি—"শব্দ-মন্ত্রাতিবর্ত্ততে" হায় অধঃপতন, 'বর্ত্তন' অতিক্রম কেন হইবে? 'বর্ত্তন' বৃত্তি। যাহা আমার আচার তাহা সনাতন; যখন তাহা খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, তখন তাহা সাধ্য, সিদ্ধ হইলে অখণ্ড মণ্ডলাকারে ইহা আমায় ঘিরিয়া থাকে। তাই মহাত্মার জীবন-তপস্যার গোড়ায় শিশুকালে ধাত্রীর কাছে যে 'রামনাম' পাইয়াছিলেন, তাহা সে দিনও মালা ঘুরাইয়া তাঁহাকে জপিতে দেখি; মন্ত্র আজ নিঃস্ব কাঙ্গাল দেশের প্রাণে বীর্য্য দান করিতে চরকার আশ্রয় লইয়াছে। এই সিদ্ধ

মহাপুরুষের জীবনদৃষ্টান্তে অর্ব্বাচীন ভারত কি বুঝিবে না, ভারতের দেবদেবী, মন্ত্র, গুরুর অতিক্রম হয় না, অনুবৃত্তিই চলিতে থাকে। ভূতের ভয়, সাপের ভয় দূর করার উপায়স্বরূপ "রামনাম" মহাত্মা গ্রহণ করিলেন—গ্রহণ করিলেন অকপট বিশ্বাসে; এই বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বলিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা ভারতের ভাষা ভাব হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। বিশ্বাস অন্ধ নয়। মানুষ আজ অন্ধ হইয়াছে। চক্ষুষ্মান্ মানুষকে অন্ধ বলা বা জীবন্ত মৎস্যে কীটদর্শন প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বাস অন্ধ, এ কথা অযৌক্তিক। বিশ্বাস ভ্রম-প্রমাদ-ভয়নাশক বীর্য্য—যে বিশ্বাস লাভ করে, তার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই; সে অভী। মহাত্মার এই বিশ্বাস জাগিয়াছিল, তাঁর রাম নাম তাঁহাকে অমর করিল।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে উত্তম রহস্য, তাহা ইহার ভিতরেই নিহিত। যেমন ধূলিকণায় চৈতন্যের জাগরণ হিন্দুজাতির সাধ্য, তদ্রূপ যে কোন আশ্রয়ে হিন্দুর বিশ্বাস মূর্ত্ত হইতে পারে। তাই মহাত্মা বলেন—মানুষ কিছুতে বিশ্বাস করুক। আজ অবিশ্বাসীর জগৎ, নিজের উপর বিশ্বাস নাই; তাই সম্মুখে ভাস্বর-মূর্ত্তি ভগবান আর্বিভূত হইলেও, বিশ্বাসহীন মানুষ অন্ধের ন্যায় সে মহারত্ন হারাইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে।

মহাত্মা অনেক অর্থব্যয় করিলেন—ইংরাজ-চরিত্র লাভের জন্য; কিন্তু ঐ রাম নাম তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল, আর সর্ব্বনাশ করিল সঙ্কল্পশক্তি—"মনসা সঙ্কল্পয়তি", মনের দ্বারা সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্প-শক্তির পরশেই মনের প্রসারতা ঘটে। মহাত্মার ত্রি-সঙ্কল্প তাঁর জীবনকে আগাগোড়া বজ্রদৃঢ় করিল। তিনি মদ্য পান করিবেন না। নিঃসঙ্গ

জীবনের তপস্যা তদনুকূল চরিত্র ও সংসর্গের ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিল; তিনি বিলাতে গিয়াও সাধুসঙ্গ পাইলেন। নারীগমন না করার সাধনা তাঁহাকে কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ প্রকারে ব্রহ্মচারী করিয়া তুলিল। মাংস-ভক্ষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া তাঁহাকে সংযমী হইতে হইল। এই আচার-রক্ষার জন্য তিনি স্মারকচিহ্ন-স্বরূপ হিন্দু-বৈষ্ণবের কণ্ঠমালা পরিত্যাগ করিলেন না। এই সঙ্কল্পপরায়ণ চিত্তে পরধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিল না। তিনি শুদ্ধাচারী বলিয়াই বাইবেল্, বৌদ্ধবাদ গীতা পড়িয়া বুঝিলেন, সর্ব্বধর্ম্মের সারমন্ত্র—ত্যাগ। ভারতই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। আমরা এইখানে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিব—হিন্দুত্ব বিশ্বজাতি বুঝিবে, যে দিন সে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা লইবে। অহঙ্কার ও বাসনার ক্ষয় হইলেই জগৎ সনাতন ধর্ম্মের সন্ধান পাইবে। মহাত্মা তাই অসংখ্য-প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়াও হিন্দুধর্ম্মকে মর্ম্ম দিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন।

তিনি ক্রমে বুঝিলেন—গীতার মর্ম্ম, পাতঞ্জলের সাধননীতি; সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ, হিন্দুভারতের উপযোগী চরিত্রগঠনের উপাদান এই পথে সহায় হইল। রাজচন্দ্রভাই বিলাতে তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন। সকল ধর্ম্মের সহিত নিজের ধর্ম্মমত বিশ্লেষণ করিয়া ধর্ম্মজীবনের পথে হিন্দুর শাস্ত্রবাণী যে অব্যর্থ নির্দ্দেশ, অভ্রান্ত আলোক দান করে, ইহা তিনি জীবনের সবখানি দিয়া বুঝিলেন; এই জন্যই তিনি বর্ণাশ্রম, গোরক্ষণ, পরলোক, হিন্দুর আদর্শে আস্থাবান্। বহুযুগ পরে ভারত একজন বিশুদ্ধ হিন্দুর বিগ্রহ সম্মুখে পাইয়াছে। হিন্দুভারত তাই বহু সহস্র বৎসর যাহা দেখে নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইল।

তার পর বিলাত হইতে ভারতে আসিয়া তিনি যে ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, সেখানে আত্মভোলা শিবের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হওয়ার সাধনায় প্রবৃত্ত করিল। বিশ্বাসের মন্ত্র দিন দিন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, তিনি সর্ব্বজীবে নারায়ণ দেখার দৃষ্টি পাইলেন। সহধর্ম্মিণীকে ইহা অনুভব করাইবার প্রচেষ্টায় তাঁহাকে নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধরিতে হইয়াছে; কিন্তু উত্তম বৈদ্যকে রোগীর বুকে হাঁটু গাড়িয়াই তো ঔষধ গিলাইতে হয়। আত্মস্বার্থ নাই যেখানে, সেখানে অত্যাচার যে অন্যের চরম কল্যাণের কারণ হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। মহাত্মা পত্নীর উপর যথার্থ অধিকার রক্ষার উপায় নিঃস্বার্থতার মধ্য দিয়াই দেখিলেন; তাঁর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই হিয়ায় হিয়ায় এক করার বিধান বাহির করিল—এমন পবিত্র দাম্পত্য যেখানে, সেখানে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্, ইহা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণেশ্বরের বীজ এখানে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পভারে সুশোভিত হইল; এখানে বাংলার নাগ মহাশয়ের জীবন সফল মূর্ত্তি ধরিল। আজ গান্ধীর জয় কোটী কণ্ঠে, তাহা নিরর্থক নয়।

তারপর কারাগৃহ। ইহা তাঁর তপস্যার ক্ষেত্র হইল। যত বারণ তাহা শাসন না হইয়া শোধনের মন্ত্ররূপে পরিণত হইল। তিনি চা-পান হইতে বিরত হইলেন, লবণের অল্পতা দেখিয়া তিনি তাহা পরিহার করিলেন; রন্ধনের মশলা বন্দীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য, তিনি রন্ধনে মশলা ব্যবহার অপ্রয়োজন ঠিক করিলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া মহাত্মা তপস্বীর চরিত্রই যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেবার পরাকাষ্ঠা—কুষ্ঠের শুশ্রূষায়। অভীর পরিচয় ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি প্লেগ-রোগীর সেবায়, অনলবর্ষী কামানের সম্মুখে ষ্ট্রেচার লইয়া আহত সৈনিকের অন্বেষণে; তাঁর এই মহৎ জীবনের আকর্ষণে

তিনি হিন্দু সাথী পাইলেন না, খৃষ্টানজাতিকে সহকর্ম্মিরূপে পাইলেন—পোলাক, ক্যালেন্‌ব্যাক প্রভৃতি সুহৃদ্ লাভ করিয়া তিনি নূতন ব্যূহ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার "সমভাব" সাধনায় তিনি অস্পৃশ্য-জাতিকে আত্মপরিবারভুক্ত করিলেন, ম্লেচ্ছ যবন বলিয়া কিছু ভেদ রহিল না। হিন্দুনারী শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি এইখানে ঠাঁই পাইল না, স্বামীর কঠোর শাসনে তিনিও বুঝিলেন—শিবের মতই তাঁর স্বামী হইয়াছে।

চরম তপস্যার ক্ষেত্র ফিনিক্স। তিনি এখানে যুক্তপরিবার গঠনের তপস্যায় নিজেকে ঢালিয়াছিলেন, জাতি বিচারের নাম গন্ধ ছিল না। এখানে উপবাসে শুদ্ধির সন্ধান পাইলেন, খাদ্যসমস্যায় রসনাবৃত্তিকে সংযত করিলেন। এখানে পাইলেন ভবিষ্যজাতির সাধন-বীজ, এখানে পাইলেন—জাতির অঙ্কুর সঙ্ঘ-জীবন; এই ফিনিক্সের জীবননীতি মাথায় বহিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর এই সাধন-সমষ্টি লইয়া তিনি প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করেন, মহাত্মা শান্তি নিকেতনে বসিয়া তপস্যার বীর্য্য দিয়া জাতিগঠনের প্রয়াস করেন; কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা তাহাকে সবরমতীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম-গঠনের সঙ্কেত দিলেন। তিনি গুরুকুলের সাধন-ভজন-নীতি অবগত হইয়া সারা ভারতের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধনা ও উপাসনার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আহ্মেদাবাদের উপকণ্ঠে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন।

ত্যাগ তপস্যার বিজয়ধ্বজা সবরমতীর চূড়ায় আজও উড়িতেছে। ফিনিক্সের তপস্যা ভারতের মাটীতে বিশাল বটের ন্যায় সারা ভারতকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি আত্মসাধনায় সিদ্ধ হইয়া

পরমাত্মার নির্দ্দেশ পাইলেন। কলিযুগে সত্য, দান, তপস্যা সম্মিলিত হইয়া যে মহা-মন্ত্রের শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, সেই উপাসনার-মন্ত্রে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে, সেই সনাতন-ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করার "জন্ম ও কর্ম্মের" নীতি অবগত হইয়া তিনি আজ উলঙ্গ দিব্য-পুরুষ। ধন্য ভারতভূমি—যুগে যুগে তার ধর্ম্মরক্ষায় এমন ভাগবত পুরুষেরই আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করি!

জাতি-গঠনে মহাত্মা

ফিনিক্সের পর, সবরমতীর আশ্রম—ইহা জাতি-বীর্য্য-স্থাপনের বেদীনির্ম্মাণ মাত্র। প্রথমেই তিনি ভারতীয় প্রণালীতে বিশ কোটী হিন্দুকে জাগাইয়া তুলিতে উদ্যোগী হইলেন। চাম্পারণে ইহার প্রথম প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হইল। নীলকরের অত্যাচার হইতে তিনি চাম্পারণবাসীকে নিষ্কৃতি দিলেন, ইহা উপলক্ষ; তাঁর আসল উদ্দেশ্য হইল, জাতিকে কর্ম্মঠ করা, নিরলস করা, সত্যে অহিংসায় দীক্ষা দিয়া নিষ্কলুষ করা। ইহার জন্য তিনি গুর্জ্জর হইতে অনুসূয়া বেন, মগনলাল গান্ধী প্রভৃতিকে আনাইলেন, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা-সাধনার পীঠ গড়িলেন, গো-রক্ষা, কৃষি প্রভৃতির উন্নতিকল্পে হৃদয় ঢালিয়া দিলেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া লইয়া চলিলেন। চাম্পারণের কার্য্য শেষ হইল না, যাহা প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহাও রক্ষিত হইল না; কিন্তু এ অমর বীর্য্য ব্যর্থ হইবে না, যথাকালে ফলপ্রসূ হইবে।

তিনি সমাজ ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে জাতিকে যন্ত্র-যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সেই সরল সুন্দর পল্লীপ্রাণ-গঠনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্র একপ্রকার নেতৃহীন। নেতৃহীন, কেননা, জাতির দিকে দৃষ্টি যাঁহারা রাখেন না, যাঁহারা আত্মসামর্থ্যে বিশ্বাসবান্ নহেন, আপনার মণিকোটায় যে রত্ন-ভাণ্ডার গোপন আছে, তার দুয়ার মুক্ত করার অভিলাষী নন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত নেতা বলিতে কুণ্ঠা হয়। জাতি নহে, রাষ্ট্র চাই, এমনই একটা অন্ধতায় ভারত-নেতৃগণ অন্ধ;

এমন কি মহারাষ্ট্রবীর তিলকও স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া বিলাতের বিচারালয়ে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়াছিলেন—অন্যে পরে কা কথা! মহাত্মা সেই জাতি-গঠনের দৃষ্টি লইয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন—এই ক্ষেত্রে এক লক্ষ নারী পুরুষকে যদি ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ করিতে পারেন, ফিনিক্সের, সবরমতীর তপস্যা জয়যুক্ত হয়। তিনি এই গঠননীতি লক্ষ্যে রাখিয়া রাষ্ট্র-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্বংসের বীজ বুকে রাখিয়া গঠনের কাজ সিদ্ধ হয় না; তিনি রাষ্ট্র-সাধকদের অহিংসা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিলেন। মহাত্মার অহিংসা-মন্ত্র বাহ্যতঃ স্বীকার করিয়া যাহারা নেতার অস্থি-মজ্জা চর্ব্বণ করার সুযোগে চিরদিন দেশ-যজ্ঞের বেদী ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করে—তাহারা দেখিল, এ মানুষ হাততালির মোহে ভুলে না, অনুগত জনের কথায় চলে না, আনুগত্যের দাবী করে—তাহারা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। মহাত্মা সৃষ্টির মাঝে ধ্বংসের বীজ নিরসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু জুহুতে তাঁহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইল। জাতিগঠনের প্রেরণা রুদ্ধ হইল না; তিনি চরকা-সংসদের এক লক্ষ সভ্য-গ্রহণের ফাঁদ পাতিলেন--কংগ্রেস যদি তাঁর কার্য্য-ক্ষেত্র না হয়, নূতন ক্ষেত্রে স্থান করিয়া জাতি-গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন।

দলে দলে নিখিল-ভারত-চরকাসঙ্ঘে নরনারী যোগ দিল; তাহাদের উপর তাঁর অনুশাসন-বাণী পৌঁছিতে লাগিল। তিনি চরকা কাটার সঙ্গে চরিত্র-শোধনের ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। এই নিছক জাতিগঠন-যজ্ঞও তিনি সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাইলেন না। মহাত্মা নিজেই বলেন—ভগবান তাঁহাকে ভারতের রাষ্ট্র-সমস্যায় বার বার লইয়া

যাওয়ায় তিনি গঠন-কার্য্যে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারেন না; কিন্তু একথা আমরা শুনিব কেন! তাঁর পদে পদে Himalayan blunder হয়, ইহা তাঁহার বৈষ্ণব-সূচক বিনয় ছাড়া আর কি—এই দিব্য-ছলনায় ভুলের পরই তাঁহাকে সিদ্ধির পথে জয়মূর্ত্তি লইয়া আগাইতে দেখি। Pro-changer'দের সাধ্য নিঃশেষ হইলে, তাঁহাকেই আবার কংগ্রেসের নেতৃপদ গ্রহণ করিতে হইল। তিনি কংগ্রেসের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে নিজের বিশ্বাস ও দিব্য প্রেরণার অনুযায়ী জাতির প্রতিনিধিমণ্ডলী গড়িয়া লইলেন। সকল সমস্যার ভার তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেস জগতের সম্মুখে ভারতের জাতি-বিগ্রহ-রূপে ঘোষণা করিল—মহাত্মাই এই জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। যে কংগ্রেসে সভাপতি-নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া রক্তারক্তি হইয়াছে, সেই কংগ্রেসের একমাত্র নেতা হইয়া মহাত্মার বিলাত-যাত্রা জাতিকে নিরেট করিয়া কতকটা গড়ার পরিচয় দেয়। কংগ্রেস জাতি নহে, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একেবারেই যে ভ্রান্ত তাহা নহে; তবে কংগ্রেসের মধ্য দিয়া জাতিগঠনের সম্ভাবনা আদৌ নাই তাহাও নহে। এই কংগ্রেস শুধু হিন্দুর কংগ্রেস নয়, ভারতজাতির কংগ্রেস—ভগবান মহাত্মাকে যদি সেই দিব্যজাতি-গঠনের সর্ব্ব সাফল্যের আনয়নে চিহ্নিত করিয়া থাকেন, তবে এই রাষ্ট্র-সাধনার ভিতর দিয়াই আমরা ভারতজাতির অভ্যুদয় অতি শীঘ্র নিরীক্ষণ করিব।

*   *
*

অস্পৃশ্য-সমস্যা ও ভারতের প্রায়শ্চিত্ত

হিন্দুস্থান ভারতে প্রায় ২৪ কোটী হিন্দু বাস করে, ইহাদের মধ্যে ছয় কোটীর অধিক অস্পৃশ্য জাতি। মুসলমানের সংখ্যা সাত কোটী ছিয়াত্তর লক্ষের কিঞ্চিৎ অধিক ; ভারতে অস্পৃশ্য জাতি এইরূপ একটা বিশাল সম্প্রদায়-রূপে পরিগণিত হইয়াছে, অথচ ইহারা হিন্দু, হিন্দুর আচার, ধর্ম্ম, রীতি-নীতির অনুসরণ করে।

অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে চাঁড়াল, মুচি, হাড়ি, বাগ্দী, মেথর, ঢুলি এইরূপ হীনবৃত্তিজীবীরই এই সংখ্যা নহে, বণিক্, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতিও আছে। কারণ শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ-শাসিত নবশায়ক যথা—

> "গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকো বারুজী।
> কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥"

সদ্গোপ, মালাকর, তিলী, তাঁতী, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত, এই নয় জাতি জলচল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আর এই শূদ্র জাতি মিলিয়া হিন্দুসম্প্রদায়। কায়স্থ প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির অঙ্গ বলিয়া প্রখ্যাত। অতএব তেইশ কোটী হিন্দুর মধ্যে দীর্ঘযুগ প্রায় সাত কোটী নরনারী ঘৃণ্য উপেক্ষিত থাকিয়াও নিজেদের হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে ; ইহা তাহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কম অনুরাগের কথা নয়। ইহারা ভিন্নধর্ম্মীর অন্তর্গত হইয়া হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড যে ভাঙ্গিয়া দেয় নাই, ইহা হিন্দুধর্ম্মের অমর বীর্য্য বলিতে হইবে।

ভারতে এই তেইশ কোটী হিন্দুর মধ্যে প্রায় এক কোটী ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুজাতির শীর্ণ-মূর্ত্তি শ্রেয়ঃ মনে করেন; তবুও পোদ, কৈবর্ত্ত, ঢুলি, রাজবংশী লইয়া হিন্দুজাতির পুষ্টিসাধনে যত্নবান্ নন। হিন্দুয়ানী অর্থে বর্ণাশ্রম, জন্মান্তর, বেদ স্বীকার করা। ভারতের অস্পৃশ্য জাতি ইহা অস্বীকার করে না; তবে তাহাদিগের ছায়া-স্পর্শে স্নান করার বিধান কেন! নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলেন, স্বপাক-ভোজনের আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, অন্যের হস্তে ভোজনাদি করিলে বাহ্যতঃ রোগাদির বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে ও মানস বিকার আসিতে পারে; এই জন্য হিন্দুসমাজে নিজ পুত্র-কন্যার হস্তেও অনেকে জল গ্রহণ করেন না—ইহা ঘৃণার কথা নহে, আচারের কথা; তবে পুত্র-কন্যা এই হেতু অস্পৃশ্য নহে, ছায়া মাড়াইলে বা গৃহে প্রবেশ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। সাত কোটী হিন্দু নরনারীকে আমরা যে শৃগাল কুকুরের অপেক্ষা হেয় করিয়া রাখিয়াছি! কর্ম্ম-গুণে তাহারা মাথা তুলিবে বটে, তুলিতেছেও তাই; যুগশক্তির হাতে আজ যাঁতায় পড়িয়া সব কলাই গুঁড়া হয়, তাহা হিন্দুসমাজের গৌরবের কথা নহে, পরাজয়েরই কথা। যদি শীর্ণদেহ হিন্দুসমাজ আত্মনিষ্ঠার অজুহাতে এই ক্ষেত্রে আত্ম-ধর্ম্ম যোল আনা বজায় রাখিতে সমর্থ হইত, হয়তো এই আত্ম-নিষ্ঠার যে বজ্রশক্তি, তাহার প্রকাশ হইয়া বিশীর্ণ হিন্দুজাতি এক অপার্থিব শক্তিতে অপরাজেয় হইত। ধর্ম্মের জন্য অস্পৃশ্যতা নহে। বণিক্ জাতিকে সেদিন যে জল-অচল করা হইল, তাহা সমাজ-শাসন-দণ্ডের প্রভাব ভিন্ন আর কি! এইরূপে আজ অসংখ্য দুলে, হাড়ি, বাগ্দী, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা, রাজবংশী সমাজে অস্পৃশ্য হইয়া আছে; ইহার মূলে সমাজ-শক্তির শাসনদণ্ডই আছে।

কোথায় তাহারা হিন্দু রাষ্ট্র বা সমাজপতির অপ্রিয় সাধন করিয়াছিল, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাহাদের হিন্দুসমাজের বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বদেশীযুগেও আমরা "বামুন ধোপা নাপিত" বন্ধ করার মরিচা-ধরা সামাজিক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছি; এখনও পল্লীগ্রামে 'ঠেকো' করার রীতি বর্ত্তমান। হিন্দু ও বৌদ্ধ বিরোধে হিন্দুজাতির মধ্যে এই ভেদ-সৃষ্টি হইয়াছিল; নতুবা সংহিতায়, ব্রাহ্মণে অস্পৃশ্য জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। মনুর বিধান হিন্দুসমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য গড়িয়া উঠে। হিন্দুজাতির আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধবাদীদের সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে হিন্দুস্থান ভারতে বিধর্ম্মীর সংখ্যাধিক্য হওয়ারই সুযোগ করিয়া দেয়—ইহা ক্ষয় অপচয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করিতে পারি। কাশ্মীর বৌদ্ধপ্রধান দেশ হইয়াছিল; হিন্দু-গৌরব বাড়িলে কাশ্মীরের বৌদ্ধগণ অনাদৃত হয়—আজ ইস্‌লাম-ধর্ম্মীর সংখ্যা সেখানে অধিক দেখা যায়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম জাঁকিয়া বসিয়াছিল; বাঙ্গালীর মধ্যে অনাচারীর সংখ্যা অধিক—পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত মুসলমানপ্রভাব হইতে দূরে ছিল; কিন্তু অস্পৃশ্য-সংখ্যা অধিক হওয়ায় ভারতে ভারতীয় খৃষ্টানের সংখ্যা এইখানেই অধিক। হিন্দুজাতি এমন করিয়া মৃত্যু শ্রেয়ঃ যদি করে, তাহা হইলে তাহাকে রক্ষা করিবে কে?

ভারতের জাতীয় ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে তাহার শাসন আছে, দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা আছে; ইহার জন্য হয় তো একদিন হিন্দুসমাজ ধর্ম্মদ্রোহীদের বর্জ্জন করিয়াছিল; কিন্তু সে প্রয়োজন এখন নাই। এই দীর্ঘ দিনের অবজ্ঞায় উপেক্ষায় ভারতের অস্পৃশ্যজাতি যদি নির্ম্মূল

হইত, প্রতিশোধ দিতে তাহারা ইস্‌লামধর্ম্মীর সংখ্যা-বৃদ্ধি করিত, স্বার্থ-বশতঃ খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুগত হইত—সমস্যার কথা ছিল না; কিন্তু আজও তাহাদের স্বধর্ম্মে আস্থা, বেদ-বিশ্বাস, বর্ণাশ্রমে অনুরাগ আছে; জাতি-হিন্দুর অপেক্ষা এই সাত কোটী অস্পৃশ্য হিন্দু কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসকে অজেয় করিয়াছে; ইহারাই হিন্দুধর্ম্মের আজ অটল হিমাদ্রির ন্যায় অটুট ভিত্তিস্বরূপ বলিতে হইবে। এই অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-কল্পে হিন্দুসমাজের দিক্ হইতে প্রাণের সাড়া না আসিয়া ভারতের রাষ্ট্র-সঙ্ঘ হইতে আসিল, ব্রাহ্মণের প্রয়াস না হইয়া শূদ্র বণিক্-জাতি ইহার জন্য প্রাণপণ করিল—তাহাতে বুঝা যায়, হিন্দুর সমাজশক্তি ভূয়া হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মণ্য-বীর্য্য স্বার্থবশে হীন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মসঙ্কট ও জাতিসঙ্কটের দিনে আমরা ব্রাহ্মণকেই ম্লেচ্ছ, যবন, শক, হূনকে বুকে তুলিয়া লইতে দেখিয়াছি; আজ স্বজাতি, স্বদেশবাসীকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়াও ভারতের হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মণজাতি একটী অস্বস্তির নিঃশ্বাসও পরিত্যাগ করে নাই—সে উদার, প্রসারিত, প্রাক্-দৃষ্টি স্বার্থপরতায় জড়তায় আজ মলিন, রুদ্ধ।

বর্ণাশ্রম-বিশ্বাসী আত্মশ্রদ্ধার দ্বারাই নিজ নিজ অধিকার আদায় করিয়া লইবে; বাংলায় মাহিষ্যজাতি, সুবর্ণবণিক্ অস্পৃশ্য হইলেও, কেহ তাহাদের ঠেকাইয়া রাখে নাই। জাতিকে দৃঢ়সংহতিবদ্ধ করিয়া মহাভারত-গঠনের যুগে জাতিবিশেষের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নহে, নিখিল জাতিকেই তাহার জন্য উদ্যত হইতে হইবে। সে প্রেরণা হিন্দু-সমাজ-পুরুষগণের নিকট হইতে আসিল না—তাই ভাবিতে হয়, সনাতনধর্ম্মী বলিয়া যাঁহারা নিজেদের ঘোষণা করেন, তাঁহারা মোহবশতঃ মিশ্রজীবন লইয়া বিপন্ন হইয়াছেন। হিন্দুত্বের যে সাধনা, যে তপস্যা, তাহা

প্রাণহীন কঙ্কালের ন্যায় অর্থহীন আচার বিচারেই পরিণত হইয়াছে; নতুবা অন্ততঃ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতির কণ্ঠে জাতি-রক্ষার ভৈরব-বিষাণ বাজিত। ভারতের বর্ণাশ্রম জাতিধর্ম্ম—ইহা একপক্ষের কথা বলিয়া যাঁহারা বর্ণাশ্রম প্রচার করেন, মহাত্মার মধ্যে ব্রহ্মণ্যবীর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদের কথার সার্থকতা বুঝা যায়। ব্রহ্মণ্য আচার পালন করার নিষ্ঠা সকল মানুষকেই তপঃশক্তিপরায়ণ করিয়া তুলে; এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছে, "কৃতযুগে কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন।" তাহার অর্থ, সে দিব্যযুগে মানুষ বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ত্যাগ, তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিল। ভারতের বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে গীতায় ইহা গুণ-ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা কিন্তু জাতি-বর্ণ স্বীকার করেন, তিনি বলেন—"...The law of heredity is an eternal law, and that any attempt to alter it must lead to utter confusion .....Varnashrama or the caste-system is inherent in human nature. Hinduism has simply reduced it to a science."

অর্থাৎ "বংশানুক্রমিক জীবননীতি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত, ইহার অন্যথা করার প্রচেষ্টা ভীষণ বিপ্লবকেই ডাকিয়া আনা; বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিতে সংক্রামিত, হিন্দুসমাজ ইহাকে মাত্র বৈজ্ঞানিক বিধানে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।"

আমরা মহাত্মার বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে উক্তিগুলি আরও বিশদ করিয়া বলি—এক শ্রেণীকে উচ্চ মর্য্যাদা দান বা অন্য শ্রেণীকে নীচ ঘৃণ্য মনে করা হিন্দুর আদর্শ-বিরোধী ভাব। ভাগবত সৃষ্টিকে সফল করিতেই প্রত্যেকের জন্ম; ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, ক্ষত্রিয় বীর্য্যে, বৈশ্য সংরক্ষণনীতিতে ও শূদ্র সেবার দ্বারা ভাগবত কার্য্য সিদ্ধ করিবে।

ইহার এরূপ অর্থ নহে, যে ব্রাহ্মণ সেবা করিবে না; তবে জ্ঞানপ্রাধান্য তার জন্মগত অধিকার, লোকশিক্ষার জন্য সে চিহ্নিত, তার রক্তধারায় এই গুণ বর্ত্তমান। শূদ্রের সেবা-বৃত্তি ছাড়া তার জ্ঞানার্জ্জনে বাধা নাই; কিন্তু সে অন্যের গুণগরিমায় ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানগরিমায় আপনাকে পূজ্য মনে করে; তবে তার পতন হয়, সে জ্ঞানের অধিকারী নয়। ভারতের বর্ণাশ্রম আত্মসংযম, শক্তি ও সম্পৎসংরক্ষণের দুর্গ। ইহার মধ্যে অস্পৃশ্যতার কথা নাই।

ভারতে পঞ্চম বর্ণ নাই, হিন্দু চাতুর্ব্বণ্যের অন্তর্গত। এই যে সাত কোটী অস্পৃশ্য, ইহারা তবে কাহারা! ইহারা হিন্দু-ধর্ম্মী বলিয়া নিজেদের দাবী করে, হিন্দুর মন্দিরে পূজাপ্রার্থী হইয়া দীন করুণ নিবেদন জানায়, পথের ধারে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে, আর বর্ণাশ্রমী হিন্দু ইহাদিগকে দীর্ঘ দিন নগরপ্রান্তে, সমাজের বাহিরে, শিক্ষাসভ্যতাহীন পশুর মত উপেক্ষা করিয়াছে। আজ হিন্দু বলিয়াই তাহাদের দাবী, আর সে দাবী ভগবান তো উপেক্ষা করিলেন না! বুদ্ধ, কবীর, দাদুর, নানক, চৈতন্য যুগে যুগে ভারতের এই কোটী কোটী দীনমূর্ত্তি নরনারীকে কোলে তুলিয়া লইতে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ভারতের হিন্দুসমাজ তাহা আমলে আনেন নাই। আজ হিন্দুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, হিন্দুধর্ম্মী নিজ বাসভূমে পরবাসী, নগণ্য হইয়া থাকে; এইজন্য অস্পৃশ্য জাতিকে ভারতের নেতৃবৃন্দ জাতি-হিন্দুর সহিত সংযুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। মহাত্মা কি রাষ্ট্রনীতিক সুবিধায় জীবন পণ করিয়া অতীতের খণ্ড তপস্যা জয়যুক্ত করিলেন! না, তাহা নহে। তাঁর ব্যথার কথা—ধর্ম্মানুভূতির দিক্

দিয়াই ইহা বাধে। যে জাতির সাম্য লক্ষ্য, সর্ব্বভূতে নারায়ণ-দর্শন ধর্ম্ম-সাধনা, সে জাতি যদি মানুষকে এমন ভাবে ঘৃণা করে, অস্পৃশ্য-বোধে দূরে ঠেলিয়া রাখে, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়—বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম ইহাতে ভারতে প্রতিষ্ঠা পায় না, গীতার বাণী সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মরাজ্য-গঠনের বেদী গড়িয়া উঠে না। এই অস্পৃশ্যতা-নিবারণ রাষ্ট্রনীতিক লক্ষ্য রাখিয়া সংসিদ্ধ হইল বলিয়া ইহা রাজনীতিক ব্যাপার নহে—মহাত্মা এ কথা বহু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বহুবার বলিয়াছেন, যে অস্পৃশ্য জাতিকে জাতি-হিন্দুর মধ্যে তুলিয়া লওয়ায় কোন ঐহিক স্বার্থ বা রাজনৈতিক লাভ আছে বলিয়া ইহাতে যেন আমরা ব্রতী না হই—ইহা আমাদের ধর্ম্ম। আমাদের গীতার কথা, উপনিষদের কথা মনে পড়ে—

> "যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
> সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥"

"জীবন্মুক্ত যে, সর্ব্বভূতের আত্মাই তাহার আত্মা। সর্ব্বভূতে যে আত্মদর্শন করে, আত্মায় যে সর্ব্বভূতের উপলব্ধি করে, সে যোগী, সেই তো সিদ্ধ।" হিন্দুধর্ম্মের এই আদর্শ ও সভ্যতা যদি রক্ষা না পাইল, তবে আমাদের বৈশিষ্ট্য কোথা! ভারতের স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় রক্তমোক্ষণের প্রয়োজন কি! মহাত্মা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে অস্পৃশ্যতা-নিবারণের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহার মধ্যে এই কথাগুলিই নিহিত ছিল—"যাঁহারা অস্পৃশ্যতানিবারণ-ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা মেথর ও চণ্ডালকে আপনার করিয়াই সন্তুষ্ট হইবেন না, যে পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্রকে নিজের মধ্যে আছে বলিয়া

অনুভব না হইতেছে, নিজেকে যতক্ষণ না জীবমাত্রের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ শাস্তি নাই। অস্পৃশ্যতা-নিবারণের মধ্য দিয়া জগতের সহিত মৈত্রী রক্ষা করার বীর্য্য পাইবে, জগতের সেবা করার অধিকার মিলিবে। এই দিক্ দিয়া অহিংসা ছাড়া উপায় নাই, অহিংসা অর্থে জীবে প্রেম—অস্পৃশ্যতা-নিবারণের ইহাই অর্থ।"

কোন দিক্ হইতে মহাত্মা অস্পৃশ্যতানিবারণের আন্দোলন তুলিয়াছেন, ইহা দ্বারা তাহা বুঝা যায়; আর বিস্মিত হইতে হয়, যে শ্রুতি-স্মৃতির গভীর রহস্য গীতার সর্ব্বোত্তম সঙ্কেত, গোপ্য, নিগূঢ় সাধনার বস্তু, তাহা সর্ব্বজনবিদিত করার কি অপূর্ব্ব কৌশল, ভারতের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার কি অকৃত্রিম দরদ তাঁহার প্রতি কথায় ও কাজে মূর্ত্ত হইতে দেখি! মহাত্মার বাণী উদাত্ত-কণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করে—"India's aim should be to repudiate western civilisation." তাহা কি অস্ত্র-যুদ্ধে, স্বার্থপরতার হিংসা-বিদ্বেষে সিদ্ধ হইবে? উহাই বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব; আমরা ইহা দ্বারা এক প্রকার প্রতীচ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করিব। মহাত্মার স্বরাজ লইয়া যে সংগ্রাম-ঘোষণা, তাহাতে স্বার্থের সংঘর্ষ অপেক্ষা সভ্যতার সংঘর্ষই অধিক আছে—সভ্যতার সংঘর্ষ সবখানি বলিতেও বোধ হয় আপত্তি নাই।

তিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন করার সাধনা-স্বরূপই অস্পৃশ্যতানিবারণ-ব্রত ধারণ করিয়াছেন; ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ব্যথা ও দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে।

ডার্ব্বানে তিনি যখন আইন-ব্যবসা করেন, তখন তাঁর কর্ম্মচারিবৃন্দ

এক-পরিবারভুক্ত হইয়াই বাস করিত; নানা ধর্ম্মী ও নানা জাতির লোক ছিল। একজন অস্পৃশ্য বংশজাত খৃষ্টান এই সঙ্গে থাকিত। মহাত্মার বাড়ী পাশ্চাত্য ধরণের হওয়ায় পয়ঃনালীর ব্যবস্থা ছিল না; ঘরে ঘরে ব্যবহৃত জল পাত্রে ফেলা হইত। মেথর রাখার ব্যবস্থা ছিল না, মহাত্মা অথবা শ্রীমতী গান্ধীকেই এই কাজ করিতে হইত। শ্রীমতী গান্ধী অন্যের জলপাত্র পরিষ্কার করিতে দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু অস্পৃশ্যের ময়লা জল পরিষ্কার করায় তিনি আপত্তি করিতেন। সিঁড়ী দিয়া এই ময়লা জলের পাত্র লইয়া তিনি অবতরণ করিতেন—ক্রোধে নয়ন-যুগল আরক্ত হইত, মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িত, আর তিনি স্বামীর উপর কটূক্তি করিতেন। মহাত্মা জীবনে যে কোন কার্য্যই করুন, তাহা সেবা আরাধনার ভাবেই গ্রহণ করিতেন। তাই বুঝি তাঁর জীবন-যজ্ঞে নারায়ণ নিত্য প্রতিষ্ঠিত—কুণ্ঠাহীন চিত্ত বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে!

মহাত্মা একবার শ্রীমতী গান্ধীর এইরূপ বিরক্তি অসহ্য-বোধে তাঁহাকে ধম্‌কাইয়া বলিয়াছিলেন, এখানে ঐরূপ ভাব চলিবে না। পঞ্চমের ব্যবহৃত ময়লা জল ফেলিয়া দেওয়ার কাজে শ্রীমতীর ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাহার উপর স্বামীর তিরস্কার অসহ্য হওয়ায় তিনি উত্তর দিলেন—"তোমার সংসার তুমিই কর। আমায় বিদায় করিয়া দাও।" মহাত্মা অস্থির হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। মহাত্মা এতখানি করিবেন, শ্রীমতী গান্ধী তাহা ধারণা করেন নাই। বিদেশে স্বামী স্ত্রীর গলা টিপিয়া পথের বাহির করিয়া দিবে, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত ঘটনা; শেষে হিন্দুপত্নী শ্রীমতী এই অবস্থায় স্বামীকে বলিলেন—"কর কি, এখানে

আমার কে আছে. তুমিই যে আমার আশ্রয়, লোকে দেখিলে বলিবে কি—বাড়ীর ফটক বন্ধ করিয়া দাও!" মহাত্মা অস্পৃশ্যের প্রতি প্রীতির আতিশয্যে কত দূর গিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া নিজেই প্রকৃতিস্থ হইলেন; ইহাতে পতিতের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাই প্রকটিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া তিনি আহ্মেদাবাদে আশ্রম স্থাপন করিলে, অমৃতলাল ঠাকুরের এক পত্র পাইলেন। তিনি এক দরিদ্র অস্পৃশ্যপরিবারকে আশ্রমে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মহাত্মা তৎক্ষণাৎ আশ্রমের নীতি ও বিধান পালন করিলে এই অস্পৃশ্য পরিবারকে গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন, ইহা জানাইলেন। এই পরিবার স্বামী, স্ত্রী ও তাহাদের এক কন্যাকে লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। প্রথম বিপত্তি—আশ্রমের ব্যয়ভার যাঁহারা বহন করিতেন, তাঁহারা হাত গুটাইলেন—দ্বিতীয় বিপত্তি ঘটিল, কূপ হইতে জল লওয়ায়। দাদুভাই অস্পৃশ্য আশ্রমবাসী, কূপের তত্ত্বাবধানকারীর হস্তে নির্য্যাতিত হইল। মহাত্মার সংসর্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদেরও কূপ হইতে জল লওয়া বন্ধ হইল। মহাত্মা সেই ব্যক্তির অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইয়া সকলকে বলিলেন—"জল লইতে কেহ কুণ্ঠা করিও না, ইহাতে যাহা হয় হউক।" অবশেষে সেই ব্যক্তি মহাত্মার আচরণে নিজেই অপ্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ হইল—আশ্রম-পরিচালনার অর্থ বন্ধ হওয়ায়। মগনলাল গান্ধী জানাইলেন, আর চলিবার উপায় নাই, টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। মহাত্মা বলিলেন "ভালই হইল। এইবার চল, আমরা সকলে অস্পৃশ্য জাতির পল্লীতে গিয়া বাস করি।" কিন্তু মহাত্মার

সঙ্কল্প কোনদিন ব্যর্থ হয় নাই; অকস্মাৎ এক ধনকুবের অযাচিতভাবে মহাত্মাকে ১৩০০০৲ টাকা দান করেন। মহাত্মা এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন। এই ঘটনাও তাঁর অস্পৃশ্য জাতির প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয়। এইজন্যই গোলটেবিল সভায় মহাত্মা অস্পৃশ্য জাতিকে হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন করিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়ার কথায় সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "I do not mind the untouchables being converted to Islam or Christianity. I should tolerate that, but I cannot possibly tolerate what is in store for Hinduism if there are these two divisions set up in every village. Those, who speak of political rights of un-touchables do not know how Indian society is to-day constructed. Therefore, I want to say with all the emphasis that I can command, that if I was the only person to resist this thing, **I will resist it with my life.**" ইহার মর্ম্মার্থ—"অস্পৃশ্য জাতি খৃষ্টান অথবা মুসলমান হইলে কোন কথা নাই, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব; কিন্তু হিন্দুর পল্লীতে পল্লীতে এই ভেদসৃষ্টির দ্বারা হিন্দুর দুর্গতি হইবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। যাহারা আজ অস্পৃশ্য জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাবী করে তাহারা হিন্দুসমাজের নিগূঢ় মর্ম্মকথা জানে না। আমি আজ আমার শক্তির সবখানি দিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেছি; যদি এমন হয়, আমিই একা ইহার প্রতিবাদকারী, তাহা হইলে আমি নিজের প্রাণবলি দিয়াই ইহাতে বাধা দিব।"

মহাত্মার কথা বজ্র। প্রধান-মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের "কমিউন্যাল এওয়ার্ড" ঘোষিত হওয়া মাত্র তিনি যে অস্পৃশ্য জাতির স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-নীতির বিরুদ্ধে আত্মবলি দিতে মাথা তুলিবেন, ইহা তাই কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই। মিঃ আম্বেদকার বহুবার বলিয়াছেন, ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাবী তাঁহাদের নাই। হিন্দুর কূপ, মন্দির অস্পৃশ্যের অধিকারভুক্ত না হউক, হিন্দু-সমাজে তাহাদের স্থান না হইলেও ক্ষতি নাই; তাহারা চায়—রাষ্ট্রীয় শক্তি; তাহারা চায়—বৃটনের শাসনে আশ্রয়ে নিরাপদ্ জীবনযাত্রা।

মিঃ আম্বেদকারের এই উক্তি মহাত্মার চিত্তকে উত্তেজিত করে নাই, আমরাও ইহার জন্য মিঃ আম্বেদকারকে দোষী করি না; কেননা, কত যুগের অপমান নীরবে সহ্য করিয়া মানুষ হইয়াও হিন্দুসমাজের আবর্জ্জনা-স্তূপের ন্যায় ইহারা আত্মরক্ষা করিয়াছে; মোগল, পাঠান, ইংরাজ যুগ মাথার উপর দিয়া বহিয়া যায়—ধর্ম্মান্তর-প্রবাহে তাহারা নিজেদের মুছিয়া দেয় নাই, নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। হিন্দুর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিবার পথে জাতি-হিন্দুর উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যই প্রবল বাধা দিয়াছে—হিন্দুর উচ্চ আদর্শে, অধ্যাত্ম লক্ষ্যে কেহ তাহাদের পরিচালিত করে নাই। শিক্ষার অভাব তাহাদের বৃটিশ-রাজ্য-প্রবর্ত্তনে পূরণ হইয়াছে; সে শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মশিক্ষা নহে, তাহারা বর্ত্তমান যুগের ন্যায় মানুষ হইয়াছে। বাংলায় শাসমল, দক্ষিণ ভারতে আম্বেদকার, রাজা মাথা তুলিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অস্পৃশ্য জাতির স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন করার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও, তাহারা প্রতিনিধি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, নিখিল হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় জাতি-হিন্দুর সহিত একযোগে কাজ করিয়াছে—কোথাও তারা অপরাধী নহে। তুচ্ছ আজ

কূপ হইতে জল তোলার অধিকার, তুচ্ছ আজ দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার, সাত কোটী মুসলমান ভারতে গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে, সাত কোটী অস্পৃশ্য তাহা কি পারে না! এতদিন হিন্দুসমাজের আশ্রয়ে মূকের ন্যায়, দীন কাঙ্গাল হইয়া তাহারা প্রতীক্ষা করিয়াছে, হিন্দুসমাজের ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; তবুও তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইতে চাহে নাই, প্রবল বৃটেনের আশ্রয়ে অস্পৃশ্যজাতি হইয়া, হিন্দু হইয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, মনুষ্যত্বের অপমান তাহাদের সত্তা আর সহিতে চাহে না। আম্বেদকারের মর্ম্মবাণী সত্যই ব্যথার বাণী। প্রবলের প্রশ্রয়ে সে বাণীর স্ফূরণ হইতে পারে; কিন্তু এই আশ্রয় যে আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদ! মহাত্মার অস্পৃশ্যতা-নিবারণের মধ্যে ঐহিক বা রাষ্ট্র-নীতিক সুবিধার কোন কথা নাই; হিন্দুর ইহা ধর্ম্ম। কর্ম্মেই তার অধিকার; কিন্তু যে ফল নারায়ণের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হয়, তাহা যে দৃষ্টি এড়ায় না! হিন্দুস্থান ভারতের সাত কোটী অস্পৃশ্য যে ভারত হইতে হিন্দু-জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে। ভারত হিন্দু মুসলমানের হউক, জগজ্জাতি ভারতের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিক, তাহা ভারতের গর্ব্ব; কিন্তু ভারতবাসী হইয়াই তাহাদের এই গর্ব্ব প্রকাশ করিতে হইবে, ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের তাহারা বিগ্রহ-মূর্ত্তি হইবে; তাহা না হইলে ভারত-জাতি-গঠনের প্রয়োজন কি? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের জন্য সংগ্রাম কেন, একের অভাব অন্যে যখন পূরণের শক্তি ধরে, তখনই মিলনের রাগিণী বাজে। প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য আছে; প্রতীচ্যের নাই—আমরা এ কথা বলি না। এই উভয় বৈশিষ্ট্যেরই সমন্বয়ে জগৎ প্রবৃদ্ধ হইতে পারে—বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ করিয়া ইহা হয় না। ভারত যদি আজ

অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা হয়, পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী তাহাতে মানবাত্মার কি যে অকল্যাণ, তাহা ধারণা করিতে পারেন না। এই যে ইংরাজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে একটা জাতি ইংরাজের ভাষা আয়ত্ত করিল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি মাতৃভাষা বিস্মৃত হইত, তাহা হইলে তাহাদের আজ এই যে খ্যাতি, 'এই যে মহিমা, তাহার যে চিহ্ন পাওয়া যাইত না! বাংলার পথভ্রষ্ট প্রতিভাশালী পুরুষদের হিন্দু-সমাজের দিকে পুনরাগমন যে কি মহাসত্যের জলন্ত পরিচয়, তাহা আজও অনেকে বুঝেন না। ভূদেব, রাধাকৃষ্ণদেব প্রভৃতি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কল্যাণ ও হিত সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মাইকেল, ব্রহ্মবান্ধবকে আমরা আজও বুঝি নাই—বাংলার ভাষা ও জাতীয়তার ইঁহারা ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অস্পৃশ্যজাতি দীর্ঘদিন অনাদৃত হইয়া থাকায়, জাতি-হিন্দুর সহিত তাহাদের ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ একই কূপে জলগ্রহণ, একই তীর্থে অর্ঘ্যনিবেদন, একই মন্দিরে সমবেত কণ্ঠে উপাসনা কি জয় ও গৌরবের বিষয়, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই। মহাত্মা তাই গোলটেবিল সভায় মর্ম্মাহত হইয়া মিঃ আম্বেদকারের ওজস্বিনী বক্তৃতা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছেন, আর বলিয়াছেন—"এইরূপ উক্তির কারণ আমি জানি, তাই আমি অধিক ব্যথিত; কিন্তু মিঃ আম্বেদকার জানেন না, তিনি কোন্ পথে চলিয়াছেন।' রাষ্ট্রশক্তি শুধু অস্পৃশ্যজাতির উন্নতির কারণ হইবে না, তাহা নহে; ইহাতে হিন্দুজাতিই ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।" এইজন্যই সাত কোটী অস্পৃশ্যজাতি ধর্ম্মান্তরিত হইলে, তাঁহার কথা ছিল না; কেননা, ইহা ঈশ্বরের বিধান বলিয়াই তিনি মানিয়া লইতেন। ভাগবতপরায়ণ নীরবে তাঁর ইচ্ছার সহিত চিত্ত

সংযুক্ত করিয়া সমতার সহিত তাহা বরণ করিয়া লইবে; কিন্তু ভারতে হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান যে ভাগবত বিধান, তাহা লঙ্ঘন করিবে কে! সে উন্মার্গগামীকে ফিরাইতে হইবে। আর সে চৈতন্যদানের উপায় মহাত্মা আত্মদান ছাড়া আর কিছু জানেন না। অধ্যাত্মপুরুষদের ইহা ছাড়া অন্য পথও যে নাই! কোন যুগে ইহার অন্যথা কোথাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি কি?

আত্মবৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান হিন্দুর আছে বলিয়াই তাহার জাতি চাই, রাজ্য চাই; আর সে জাতি ও রাজ্য ভাগবত জাতি ও স্বর্গরাজ্য। হিন্দুর জাতি-বর্ণ-রক্ষা, স্বরাজ্যলাভের প্রচেষ্টা কি মহালক্ষ্যসাধনের জন্য, তাহা ত্যাগবৈরাগ্যপ্রদীপ্ত, বাসনাহঙ্কারশূন্য বিশুদ্ধ চেতনা ছাড়া আর কোথাও স্ফুরিত হইবে না; আর এইজন্যই বোধ হয় ভারতের এই সাতকোটী উপেক্ষিত হিন্দুসমাজাঙ্গকে আত্মসাৎ করিয়া ভোগবাদী জগৎ দুর্জ্জয়মূর্ত্তি-ধারণের আশা করে ও এই সুযোগের দিকে লুব্ধদৃষ্টি রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়। কিন্তু ভারত কি চায়, ইহা কেহ এখনও বুঝে না। তুলসীদাসের কথায় বলি—

"জাতু পাতু ন পুছতি কোই।
জো হরিকো ভজে সেই হরিকো হোই
হরিজন, হিজড়া, হুরকনা, সতী, শূরমাদি জোই
ই সব জাতিঁমে উনজে হন্‌কে জাতি ন হোই॥"

"কোন জাতি একথা জানিতে চাহে না, যে হরির ভজনা করে, সে হরির হইয়া যায়। যে হরিভক্ত সে হিজ্‌রা হুরকা, সতী, সাহসী, বীর—ইহারা সব জাতির মধ্যেই জন্মে, ইহাদের জাতি নাই।"

ভারত ভাগবতজাতির ক্ষেত্র; ভারতে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প

অব্যর্থ—ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য; এই স্বাতন্ত্র্য তাই জগৎকল্যাণের হেতু। ভারত আজ অস্পৃশ্যকে বুকে তুলিয়া লইল, সর্ব্বজাতিকেই একদিন সে আপনার করিয়া লইবে।

Selt-Sacrifice—**"আত্মোৎসর্গে"** ভারতের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ভারতের রাষ্ট্রজাতি কোনদিন ছিল না, এই অপবাদ একেবারে মিথ্যা নয়। রামরাজ্য, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য, অশোকের রাজ্য, পালরাজ, গুপ্তরাজ প্রভৃতি ভারতশাসনে বহুরাজ্যের উত্থান পতন হইয়াছে, ভারত-জাতির অভ্যুদয় কোন যুগে হইয়াছে বলিয়া কোন নজীর পাওয়া যায় না। ভারতে একটা অখণ্ডজাতির রাজশক্তি এ পর্য্যন্ত আমরা লক্ষ্য করি না, ভারত নানাজাতির জন্মভূমি; জাতি-বিশেষ, ধর্ম্ম-বিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ মাথা তুলিয়াছে; আজও ইংরাজরাজ্যের পশ্চাতে ভারত-জাতির মেরুদণ্ড নাই। এইরূপ বহুবার বহু রাজ্য গড়িয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে—ভারত-জাতি বলিয়া একটা অখণ্ড সমষ্টিকে আমরা কোন যুগে মাথা তুলিয়া উঠিতে দেখি নাই।

আজ ইংরাজশক্তি ভারতে জাতি-গঠনের প্রচেষ্টা করিতেছেন। যে স্বার্থসংসিদ্ধির কারণ দেখিয়া আমরা তাঁহাদের প্রতি কর্ম্ম সংশয়ের চক্ষে দেখি, তাহা শাসক ও শাসিতের মধ্যে নিগূঢ় ভেদ ও অস্পষ্টতার ফল; পরন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে স্বার্থই যে এই জাতিটাকে ভারতবর্ষের উন্নতি-কামনায় উদ্বুদ্ধ করে তাহা নহে, অনেক সময়েই ব্যক্তিগত সংস্কার ও জাতিগত স্বার্থ এই সকল কর্ম্মে অনুস্যূত থাকিলেও, বিধাতার সঙ্কেত ইহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

ভারতের ভাষা—দেবভাষা। সে ভাষা সর্ব্বজাতির ভাষা ছিল না। ইংরাজের স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার জন্য হয় তো ইংরাজী ভাষার প্রচলন

হওয়ার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু ইহাতে আমরা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর সহিত মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়াছি। ইংরাজ মিশনারীগণ এ দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া কৃতকার্য্য হন নাই; কিন্তু ভাষাপ্রচারে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহাতে যদি বলা যায়, যে ভারতের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ছিল না, শিক্ষাপ্রচার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনায় সফল হইয়াছে, ধর্ম্মান্তরে সে স্বার্থ অধিকতর সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভাষার প্রয়োজন হইয়াছিল; সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই—শিক্ষা-প্রচারে এ জাতির কার্পণ্য ছিল, প্রয়োজন-বোধ ছিল না।

এই কার্পণ্য ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনের ফল বলিলে ভুল করা হইবে। প্রয়োজন-বোধ হয় নাই; কেন না, জাতি-গঠনের উপাদান বলিয়া ইহা বোধে আসে নাই। পর-রাজ্যে ভাষার ব্যাপ্তি সহজ নহে; মহাত্মা বাল্যকালে অনুভব করিয়াছিলেন, যে—"Every Hindu boy and girl should possess sound Sanskrit learning." "প্রত্যেক হিন্দু বালক বালিকার ভাল করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত।" ইহা তাঁহার হিন্দুজাতির স্বভাব-সংস্কারের প্রভাব; তারপর রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষার প্রয়োজন বুঝিয়া ইহার জন্য আজ পর্য্যন্ত তাঁর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর যুদ্ধ-সভায় তিনি লাট দরবারে দাঁড়াইয়া প্রথম হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন—ভারতে ইহা অভিনব ঘটনা। তাহার পর, হিন্দীকে জাতীয় ভাষা-রূপে প্রবর্ত্তিত করার কাজে প্রথম কয় বৎসর তিনি খুবই পরিশ্রম করিয়াছেন। অমৃতসহর কংগ্রেসে তাঁর ইহাই একমাত্র কার্য্য ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, বর্ত্তমান ভারত রাষ্ট্রগঠনের যুগে উপস্থিত হওয়ায় জাতীয়

ভাষার দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িয়াছে। মহাত্মার যখন যে বিষয়ে লক্ষ্য পড়ে, তখন সেটা তাঁর খেয়াল মাত্র নয়; দেশ, জাতি, ধর্ম্মের দিক্ দিয়াই ইহা বীর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পায়। এইজন্য ভারতে জাতি-গঠনের কাজে ভাষার প্রয়োজন-বোধ মহাত্মার মধ্যেই প্রথম উদিত হইল, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিব।

ভারত ধর্ম্মপ্রাণ—ইহা প্রখ্যাত কথা। ধর্ম্মমীমাংসা এ জাতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। সমগ্র জাতি লইয়া এ কথা নহে। ধর্ম্ম বিজ্ঞান-বস্তু; কাজেই অধিকারী পুরুষগণের ইহা অনুশীলনের সামগ্রী, জনসাধারণের নহে। পরীক্ষাগারের বাহিরে ইহা আসিলে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইবে; কিন্তু আশ্চর্য্য, ধর্ম্মের বিশ্লেষণে ইহার বৈচিত্র্য-লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতে ধর্ম্মভেদ তাই খুব স্বাভাবিক। অনেক গবেষণা ও নিবিড় আলোচনার ফলে, ভারতে ধর্ম্মের একটা সর্ব্বজনসম্মত বিধান স্থির হইয়াছিল। ভারত-জাতি বেদকে তাহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিল, আর প্রকৃতি-ভেদে প্রকাশ-ভেদ মানিয়া লইয়াছিল; শেষের স্বীকৃতি-ফলে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজশক্তি গড়িয়া উঠে। ভারত এই অনুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া জাতিগঠনের প্রচেষ্টা করিতে থাকে।

কিন্তু ভারতের ধাতু এ নীতি স্বীকার করিল না—বেদে বিশ্বাস করিলেও, উপাসনায় ভেদ জন্মিল; উপাসনা-ভেদে জাতিভেদের সৃজন হইল। শৈব ও বৈষ্ণবের সংগ্রাম ভারতে যেন দেবাসুর সংগ্রাম—উপাস্য-ভেদ দূর না হইয়া ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এক অদ্বয় তত্ত্ব রুচি ও প্রকৃতির ভেদে বিভিন্ন হইয়া পড়ে; দেবতার মন্দির তাই একই

বিগ্রহ-মূর্ত্তির তীর্থ হইয়া উঠিল না। সাংখ্যবাদের বহু পুরুষের ন্যায় ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম-রূপে প্রত্যেকের বিষয় হইয়া উঠিল। এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মত ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য লইয়া জাতি-গঠনের প্রয়াস, ব্যক্তি-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের অভ্যুত্থানপ্রয়াস অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, ইহা এক অনির্ব্বচনীয় তপস্যা!

এই তপস্যা ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষদের দিব্যচক্ষু প্রদান করিল—সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখিতে গিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণকে শূদ্র দেখিলেন না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দেখিলেন না; গো, মৃগ, পক্ষী সবে একাকার দৃষ্টিতে বিশ্ব চিত্রের উপর কালি ঢালিয়া দিলেন না—মায়াকে বর্ণনাতীত বলিয়া ধর্ম্মকে বৈচিত্র্য-রচনার সূত্র-রূপেই অনুভব করিলেন। সাম্য, শান্তি, আনন্দ আত্মদর্শীর হৃদয়ে হৃদয়ে উছলিয়া উঠিল—আকার, বর্ণ, প্রকৃতির ভেদে হৃদয়-ভেদ হইল না, ভারত আবার মহাভারত গড়ার আয়োজন করিল।

কত কল্পের সাধনায় যে এই দৃষ্টি ভারত লাভ করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈচিত্র্যের মাঝে একের রাজ্যবিস্তারকামনায় ভারতের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইল, স্বরূপ-সাধনায় সিদ্ধজাতির দেশ ও রাজ্য গঠন করার প্রচেষ্টায় মাতিয়া উঠিল। কিন্তু পৃথিবীর ধর্ম্ম জীবের অনুভূতির অনুগত হইল না; সে উর্দ্ধ-জগৎ হইতে যত অমৃত ঝরিয়া পড়ে, রাক্ষসীক্ষুধায় তাহা এক নিমিষে শুষিয়া শেষ করে—ধর্ম্মানুভূতির অমৃত মর্ত্ত্যের বুকে উৎস সৃজন করিল না। কিন্তু এই মহান্ প্রয়াসের অন্তও হইল না; পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করার সাধনা নিরন্তর প্রবাহে বহিল—কত রক্ত ঝুঁজিয়া পড়িল, কত প্রাণ-বলি পড়িল—পৃথিবীর রূপান্তর যে আজও হইতে চাহে না!

একদল মানুষ মুখ ফিরাইলেন ; ভারতে উঁহাদের অনুসরণ করার মানুষও কম ছিল না। ভারতের প্রাণ দ্বিধা-বিভক্ত হইল—লয়বাদী ও লীলাবাদী। লয়বাদীদের যে পৃথিবী লইয়া সমস্যা, তাহা তাহাদের দুর্ব্বলতা ; লীলা-বাদীদের দরদ পৃথিবীর উপর তাহাদের অকৃত্রিম অনুরাগের ফল। শেষোক্তেরা এই প্রেমের রসায়নে পৃথিবীর ধূলি স্বর্ণরাশির আকারে পরিণত করিতে চাহে; জীবনের ভোগবতী মন্দাকিনীধারায় রূপান্তরিত হউক; ইহাই তাহাদের দুর্জ্জয় ইচ্ছা—এই ইচ্ছার উৎস-মূল স্বয়ং নারায়ণের নাভি-কমলে, এই হেতু ইহার বিরাম নাই।

পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকা-পাষাণ-স্তরের স্তূপ তবু যেন বিদীর্ণ হইতে চাহে না! আত্মদানেরও সীমা নাই। ইহা কাহার প্রায়শ্চিত্ত, অভিশপ্ত পৃথিবীর উত্তর নাই ; তবে অসংখ্য মহাপ্রাণের উৎসর্গ-কাহিনী ইতিহাসে অনাহত করুণ রাগিণী রূপে বাজিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রাহ্মণের কণ্ঠেই বেদের ঋক্ প্রথম ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণই সত্য, তপঃ, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, অহিংসা প্রভৃতি অমিশ্র সত্ত্বগুণাশ্রয়ে পৃথিবীকে ব্রহ্মক্ষেত্রে পরিণত করায় উদ্বুদ্ধ হইলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত ব্রাহ্মণেরই তপঃক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিমান্ নারায়ণ, শ্রীবিষ্ণুর কায়ব্যূহ-মূর্ত্তি। কিন্তু পৃথিবীতে যে ভোগোন্মাদনা, তাহার সম্মুখে এই ত্যাগবৈরাগ্যদীপ্ত ব্রাহ্মণের আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠা সহজে হয় নাই। অথর্ব্ব হইতে জাত, শান্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত ভারতের দধীচি দেব ও অসুরগণের ষড়যন্ত্রে আত্মনিষ্পীড়নের পাষাণ-ঘর্ষণে বজ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। ভোগবাদ দুই জাতিরই আদর্শ—ভিন্ন-মাতার গর্ভে জন্ম, বীর্য্য একেরই। ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম নারায়ণ-ধর্ম্ম ; বিশ্বকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণ-জাতি-

সৃজনের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি জাতিগঠনের ভিত্তি-তলে আপনার বজ্রাস্থিগুলি একে একে সংন্যস্ত করিলেন। দধীচির আত্মদান ভারতের অপূর্ব্ব কাহিনী! এখনও ব্রাহ্মণের মধ্যে দধীচির উৎসর্গ-বীজ অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়; কিন্তু কোথায় সে তপস্যা, কোথায় তপস্বী ব্রাহ্মণ, যারা উৎসর্গের হোমানলে আত্মাহুতি দিবে!

ব্রাহ্মণের পর ক্ষাত্র-শক্তির আবির্ভাব। ব্রহ্মণ্য-শক্তিকে পরাভূত করার ষড়যন্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র সংলিপ্ত হইযাছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণ-রোষে অভিশপ্ত ও ক্ষতকায় হইয়া রহিলেন। ক্ষত্রিয়শক্তির জাগরণে ব্রহ্মণ্য-শক্তি যেন ম্লান হইয়া পড়িল। যে অহিংসা ব্রত-সিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রেম ও শান্তির রসায়নে পৃথিবীর দিব্যগঠন অভিলাষ করিয়াছিলেন, জাতিগঠনে বেদমন্ত্রের ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, আত্মার অমরত্ব-প্রতিপাদনে ভারতকে অমৃত-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, চতুরাশ্রমের ভিতর দিয়া মানবচরিত্র-গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বর্ণধর্ম্মে সমাজ গড়িয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণই হিংসার পাশুপত অস্ত্রে ক্ষত্রিয়-রুধিরে সমস্তপঞ্চক নামক পাঁচটী শোণিত-সরোবর সৃষ্টি করিলেন। বিরোধের আগুনই জ্বলিল। ক্ষত্রবীর রঘুপতি পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন; কিন্তু ক্ষাত্রশক্তির এই অভ্যুদয় ব্রাহ্মণের অসহনীয় হইল। ইহার উপর ভারতের অস্পৃশ্য জাতিকে কোল দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-ভারতের একেবারে চক্ষু-শূল হইলেন! গভীর ষড়যন্ত্রে এই মহাপ্রাণ আজন্ম নির্য্যাতিত হইয়া শেষে আত্মোৎসর্গের সলিলেই অবগাহন করিলেন—ইহাও কি ভারতের প্রায়শ্চিত্ত!

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যদি ভাগবত গুণাশ্রিত বোধে সম-সূত্রে মণিগণের ন্যায় আত্মবৈচিত্র্যের অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিতেন, তবে বোধ হয় ভারতে জাতিগঠনের মন্ত্র সেদিন সিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা হইল না।

কুরুক্ষেত্রে ব্যাসদেব-সমর্থিত কৃষ্ণপ্রাধান্য সকলে স্বীকার করিয়া লইলেন না। কুরুক্ষেত্রে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি পুড়িয়া ছাই হইল। দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ আত্মঘাতী হইয়াও ভারতের জাতি-গঠনের সহায় হইলেন না। সে অবসাদের মর্ম্ম-পীড়ায় ভূলুণ্ঠিত শোণিতলিপ্ত যদুকুলপতির মৃত্যুশয্যা ভারতের প্রায়শ্চিত্ত-পর্ব্বের এক মহাঙ্ক নহে কি?

আমরা জুডিয়ায় নরগুরুর শোণিততর্পণ দেখিয়াছি; ভারতে যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য এই আত্মোৎসর্গের রক্তপ্রস্রবণ তেমন করিয়া দেখি না, দেখিবার প্রয়োজন মনে করি না। আমরা জানি, ভারতে সনাতন আদর্শ স্থাপন করার ইহা ব্যতীত পথ নাই; ভগবানের চিহ্নিত সন্তানকে এইরূপ আত্মদানের রক্তেই ধরণীর কলুষ নিষ্কাসিত করিতে হইবে।

সে প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কোলরাজের হস্তে কুরেশাদির জিহ্বাকর্ত্তন, চক্ষু উৎপাটন করার ইতিহাসও তো অগ্রাহ্য করিবার নয়। ভক্ত বৈষ্ণব হরিদাসের রক্তাক্ত কলেবর, অথচ মুখে সে শান্তি ও আনন্দের মধুময় হাস্যরাশি উৎসর্গ-যজ্ঞে উদ্বুদ্ধ প্রাণেরই পরিচয় দেয়। চণ্ডীদাসের প্রাণ-বলির কথাও তো ভুলিতে পারি না, নবদ্বীপচন্দ্রের আকুল কণ্ঠ জগাই মাধাইয়ের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছিল—পৃথিবীর বুকে তবুও তো করুণার উৎস ঝরিল না! নীলাচলে যে উৎসর্গের আগুন জ্বলিল, তাহা কি নিভিবে বলিয়া মনে হয়! আর দক্ষিণেশ্বরে অমৃত-শীতল-কণ্ঠের বাণী উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া রক্ত-মাংসের যন্ত্রের শব্দ-নালী ছিঁড়িয়া যে রুধির ঝরিল, তাহা কি ভারত কোনদিন মুছিয়া ফেলিতে পারে? আজ চক্ষের সম্মুখে তাহারই পুনরভিনয় দেখিয়া আমরা হাহাকার করিতেছি—প্রতিকারের ঋজুপথে পা আমাদের

চলিতে চাহে কে? আজ ফরাসী ঋষি রোঁমা রোঁলার কথারই তাই প্রতিধ্বনি করি—"The way to peace leads through self-sacrifice" "পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথ আত্মোৎসর্গ" "...the only thing lacking is the Cross"..."যীশুকে ক্রুশে লটকাইয়া তাঁর আত্মদানের রক্তে বসুন্ধরা অভিষিক্ত হইয়াছিল, এখানে কেবলই এই বস্তুটীরই অভাব পরিদৃষ্ট হয়।" প্রাচ্যের জাগরণ সত্যই কি আত্মবলির রক্তে পৃথিবীর খর্পর পূর্ণ করিয়াই হইবে? মহাত্মার প্রায়শ্চিত্তের পশ্চাতে সনাতন ভারতের এই তথ্যই যেন নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়!

* *
*

জগদ্বরেণ্য মহাত্মা

ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে জগতের সর্ব্বজাতির শোণিত-তর্পণ হইয়াছে। স্বার্থই যে রক্তপাতের সর্ব্বপ্রধান কারণ তাহা নহে, ইহার পশ্চাতে ছিল একটী নূতন সভ্যতা ও আদর্শের সংবেগ। জর্ম্মণ-সম্রাট কাইজার ছিলেন তার কেন্দ্র-পুরুষ; বিশ্ব-সম্রাটের আসনে বসিয়া তিনি পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

এই স্বপ্ন যুগে যুগে মানুষ দেখিয়াছে, উন্মাদ হইয়াছে। প্রাচ্যের প্রাণ এই আদর্শের প্রভাবেই অভিনব আকার ধারণ করিয়া দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়াছে। খুব তলাইয়া দেখিলে, এই সকল স্বপ্নের মূলে ভারতের দান অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আমরা বর্ত্তমান জগতে যে কয়টী মহাপ্রাণের জাগরণ দেখিয়াছি, তাঁহাদের সহিত ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের প্রভেদ কোথায়, মাত্র সেইটুকুরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই পুণ্যচরিত শেষ করিব।

জর্ম্মণ-রাজ কাইজার নিজেকে একজন ভগবানের চিহ্নিত মানুষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের উপাসনায় জর্ম্মণ-জাতি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা পশুবলের সাহায্যেই জগতে সিদ্ধ করিতে তাহার অভিযান। স্বার্থ ও আদর্শ—এই দুইয়ের সংঘাতে বিশ্বব্যাপী আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এইরূপ মহাকুরুক্ষেত্রের পরই মানুষের চিত্ত কথঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হয়, সত্যের আভাস ফুটিয়া উঠে; এই ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। যুক্ত রাষ্ট্রের কর্ণধার উইলসন

সাহেব জগজ্জাতির মুক্তি-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন; সে বাণী উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল অধিক করিয়া তাহাদেরই, যাহারা প্রবলের পাষাণভার বুকে বহিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। ভারতও অকাতরে ইউরোপের কল্যাণে তাহার শোণিতবিহীন শুষ্ক অস্থি বিছাইয়া দিয়াছিল—তখন প্রবুদ্ধ করিয়াছিল ভারতকে বৃটনের বাণী; তাহার পশ্চাতে ছিল, উইলসনের বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন। দুর্ব্বলের অভ্যুত্থান-পথে মিত্রপক্ষের আনুকূল্য মিলিবে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রে জগতের বিভিন্ন জাতির হাতে মুক্তির পতাকা তুলিয়া দেওয়া হইবে—ইহা অক্ষম জাতির সম্মুখে কম প্রলোভনের কথা নহে। জাতি-সঙ্ঘের হৃদয়ে যে সত্য ও উদার ভাব সেদিন উদিত হইয়াছিল, তাহা নিছক কাপট্য নহে; তবে মৃত্যু-লীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ মনে হয়, উহা প্রবল জাতি-সঙ্ঘের শ্মশান-বৈরাগ্য। মিত্রপক্ষের প্রতিশ্রুতি কোথাও যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু জর্ম্মণীর পরাজয়ে বিশ্বজাতির পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল না। দুর্ব্বল, পীড়িত মানবাত্মা মুক্তির স্বপ্নে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। মানবাত্মার মুক্তি-পিপাসা জড়শক্তির বাধায় কোথায়, কোন যুগে প্রতিহত হইয়াছে? জগৎ বিস্মিত হইয়া দেখিল, রুশের কত শতাব্দীর পতিত, নিপীড়িত, মূক জন-সঙ্ঘ পরাক্রান্ত জারের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইল। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের মূলে যে শক্তিধর মানুষটী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া জগতের লোক বিস্মিত হইল। কোন অভাবনীয় শক্তি ও কৌশলে এত বড় দুঃসাধ্য কর্ম্মটী যে এমন ক্ষিপ্রভাবে সুসিদ্ধ হইবে, এ কল্পনা কেহ করে নাই; কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত রহিল না, আরও যখন দেখা গেল, রুশ-বিপ্লব-যজ্ঞের পুরোহিত,

সেই নিঃস্বার্থ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ, দীন কাঙ্গালের বন্ধু রাজ্যেশ্বরকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে পথের ধূলিতে মিশাইয়া দিয়া, রুশের অধিবাসীদের শুনাইলেন—"Everything belongs to you, everything, take everything. The world belongs to the proletariat. But believe no one but us. The workers have no other friends. We alone are the friends of the workers." অর্থাৎ "তোমরাই সব কিছুর অধিকারী। সবই তোমাদের। সবখানিই তুলিয়া লও। বসুন্ধরা শ্রমিকদের। বিশ্বাস অন্য কাহাকে করিও না, যারা শ্রমিক তাদের শ্রমিক ভিন্ন বন্ধু নাই।"

এমন মন্ত্র রুশের অধিবাসী কোনদিন শুনে নাই, শুনিতে ভরসাও করে নাই। তাহারা জানিত, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি রুশের সম্রাট্। পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ ও অধিকার সম্রাটের, তাহারা তার ভৃত্য। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে পালপার্ব্বণে যুগ যুগান্তর ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাহারা জারের উপাসনা করিয়াছে, গীর্জ্জায় জারের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ধন্য হইয়াছে। কত যুগ এমন করিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখিয়াছিল! আজ অকস্মাৎ আত্মার হুঙ্কার শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইল; কিন্তু উৎসাহে তাহাদের প্রাণ নাচিল, অগ্নিময় হইল, কোটীকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—"That is a man for whom I would give my life." প্রত্যেকে বলাবলি করিতে লাগিল—"এই একটী মানুষ, যাহার জন্য আমি আমার প্রাণ দিতে পারি।"

এই অদ্ভুত মানুষটীর জন্ম রুশের এমন অবস্থায়, যে যুগে ঠিক ভারতের মতই কেবল বড় বড় কথা, ভাব, স্বপ্ন-বিলাস চলিতেছিল,

মানুষ মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের ন্যায় এই সকল বাণীর অনুসরণ করিয়া হতাশ হইয়াছিল, উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দুরবস্থার প্রতিকারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল—লেনিনের অভ্যুদয়ে তাহাদের মনে আশার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। তাহারা দেখিল—এই একজন মানুষ, যাহার কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, যে যাহা কিছু বলে, অন্যের হাত দিয়া তাহা সার্থক করিয়া লওয়ার চাতুরী জানে না, নিজের জীবন দিয়াই তাহা সফল করিতে আপনাকে ঢালিয়া দেয়। তাহার মুখের প্রত্যেক বাণীটী রুশকে মাতাইয়া তুলিল—"Life, practice is the basic angle from which the the cry of knowledge must be treated." "বুদ্ধির দর্শন জীবনে, কর্ম্মে সিদ্ধ করিয়া তবে ইহার সাফল্য আনিতে হইবে।" পৃথিবীকে জানিতে হইলে, দুই হাতে তাল পাকাইয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—বীরের কথা!

তাঁহার প্রত্যেক কথাটী কি এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিত, তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মটী একটা ঐতিহাসিক কাণ্ডে পরিণত হইত; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে এত বড় শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া বুঝা যাইত না; অতি সাধারণ লোকের মতই তাঁর অঙ্গের আকৃতি, সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের মতই তাঁর মুখশ্রী, কিন্তু এমন প্রলয়-বীর্য্য লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন! লেনিন শুধু রুশের নয়, জগতের লোক তাঁহাকে পূজা করিতে শিখিয়াছে। একজন মনীষী ইংরাজ বলেন—আজ রুশের এই বিদ্রোহী নেতাকে বৃটন সভয়ে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহে, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, লেনিনের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া লণ্ডনের কোন এক সাধারণ স্থানে তাঁহাকে স্থাপন করিবে। মহত্ত্বের পূজা বৃটন দিতে কোন যুগে কৃপণ হয় নাই।

লেনিনের কর্ম্মনীতি—উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে নির্ব্বিকারে নির্ভয়ে আগাইয়া যাওয়া; সে ভীমগতি রুশের প্রচণ্ড শক্তি বাধা দিতে পারে নাই। লেনিনের অন্তঃশক্তি মূর্ত্ত হইয়াই যেন বাহিরে শ্রমিক-সমষ্টির বিগ্রহ-মূর্ত্তি; নিজের উপর তাঁর যেমন অটল বিশ্বাস ছিল, এই প্রোলেটেরিয়টদের উপরও সেই একই বিশ্বাস যেন রূপ লইয়া ফুটিয়াছিল। লেনিন আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এই জনসাধারণের মধ্যে—তাই তিনি এমন এক সাম্রাজ্য গড়িয়া গিয়াছেন, যেখানে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন নাই, এক অপৌরুষেয় শ্রমিক-সঙ্ঘের দ্বারাই ইহা শাসিত, পরিচালিত এবং সংরক্ষিত।

লেনিনের আত্মবিশ্বাসের তুলনা নাই; অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মর্ম্মে আঘাত দিতে এক মুহূর্ত্তও তিনি চিন্তা করিতেন না; তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ ছিল অভ্রান্ত। তাঁর একজন নিকট বন্ধুর কথা—"It was characteristic of Valdamir Illich that he never hesitated to take the responsibility for every step, even if the fate not only of himself and his party, but of the whole country might depend upon it......." ইহার মর্ম্মার্থ "তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন দিন তাঁর প্রতি কার্য্যের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই—ইহার উপর শুধু তাঁর নিজের অথবা দলের ভবিষ্যৎ নয়, পরন্তু সমগ্র রুশের ভাগ্য নির্ভর করিলেও"। ১৯০৪ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে একটা শতচ্ছিন্ন পিরান গায়ে জড়াইয়া বিপ্লবপ্রচার কার্য্যে পরিণত করার জন্য অসাধারণ শক্তিশালী জারের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেদিন ধনী, রাষ্ট্রবিৎ, অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক সকলে তাঁহাকে

একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নিরেট মূর্খ বলিয়া হাসিয়া সারা হইয়াছিল ; লেনিন কিন্তু প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সম্মুখে শুষ্কপত্রের ন্যায় সেদিন উড়িয়া গিয়াও বিপ্লব-নীতির উপর আস্থাহীন হইলেন না। মরণভয়হীন এই লোকটার কথা—"The attack on the enemy must be as energetic as possible ; the watch-word of the masses should be 'attack' not 'defence'." "শত্রুর প্রতি যতদূর সাধ্য আক্রমণের শক্তিই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাই হইবে জনসাধারণের নীতি—আক্রমণ, আত্ম-রক্ষা নহে।"

হত্যা লেনিনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় ; বাধাকে অতিক্রম করার দ্বিতীয় উপায় তিনি দেখেন নাই। সম্মুখে হিমালয় পড়িলে, তাহার উপর ভীম মুষলাঘাতই তাঁর ধর্ম্ম ; পাহাড় ধূলিসাৎ করিয়া লেনিন আগাইয়া যাইবেন। তিনি জানিতেন—গতি তাঁর রুদ্ধ হওয়ার নয়, পথে বাহির হইয়া ভাবিবার কিছু নাই। বাধাকে বিদলিত কর—চূর্ণ কর—এই পৌরুষ-বাণীই আগাগোড়া তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।

রুষের বুকে প্রচণ্ড রক্তপিপাসু অসুরের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়া গর্কির উৎকণ্ঠা হইয়াছিল। লেনিন তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—"What would you have ? Is humanity possible in such a furious struggle ! Can we allow ourselves to be soft-hearted and magnanimous when Europe is blockading us...... and counter-revolution is rising against us on every side ! No, excuse me, we are not imbeciles ! We know what we want and no one can stop us from doing what we think right."

"তুমি কি বলিতে চাও মনুষ্যত্বের দাবী এই জীবন-মরণ-রঙ্গে অসম্ভব। সমস্ত ইউরোপ যখন আমাদের পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে, তখন হৃদয়ের ধর্ম্ম থাকে না, মহত্ব দেখান যায় না; বিশেষতঃ, আমাদের চতুর্দ্দিকে বিরুদ্ধ শক্তি মাথা তুলিয়াছে। না, না, আমায় ক্ষমা কর, আমরা ক্লীব, পঙ্গু নই। আমরা জানি, কি আমরা করিতে চাই; আমাদের যে কাজ ন্যায়-সঙ্গত মনে হইবে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।"

এই রক্ত-যজ্ঞের পুরোহিত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভল্গা নদীর তীরে সিমবারস্ক নগরে তাঁহার জন্ম। পিতা একজন সরকারী বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লেনিনের রুশ-বিপ্লব-সংসর্গে আসিয়া পড়ার হেতু, তাঁহার সহোদর একজন বিপ্লবী ছিলেন; ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, জারের হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে তাঁহার ফাঁসী হইয়া যায়। লেনিনের মনে রক্তবিপ্লবের বীজ ইহাতেই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে এমন নিষ্ঠুর, দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছিল। চিরজীবনই একপ্রকার নির্ব্বাসনে, বিদেশে আত্মগোপন করিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্তঃ-সাধনায় তিনি রুশের নিপীড়িত জাতির সহিত হৃদয়ের সুর মিলাইয়া লইয়াছিলেন। শ্রমিক-সঙ্ঘের তিনি বিগ্রহ, ধনিকের নহেন; শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এই সকলের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। শ্রমিকের রাজ্য পৃথিবীতে জয়চ্ছত্র উড়াইবে—কার্লমার্ক্সের ভবিষ্যন্মূর্ত্তি লেনিন শ্রম ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুর অস্তিত্ব দেখেন নাই। অন্যের শ্রমে যে আরাম-কেদারায় শান্তি-সুখ ভোগ করে, সে দস্যু, সে অত্যাচারী; তাহাকে নিষ্পেষিত করা, নির্ধন করাই লেনিনের বাণী এবং বিপ্লব বিদ্রোহের

ঝড় তুলিয়াই তাই তিনি রুশে বলশেভিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁর স্বপ্ন—নিখিল জগতের শ্রমিকই একদিন তাঁহার অনুসরণ করিবে।

ধ্বংস যদি তাঁর শেষ কথা হইত, লেনিনের প্রতিষ্ঠা ভস্মস্তূপের ন্যায় হেয় অপদার্থ বোধে মানুষ বিস্মৃত হইত; ইহার পশ্চাতে তাঁর স্বপ্ন ছিল, আদর্শ ছিল—লেনিনের ইহাই বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাঁর অমৃত-তত্ত্ব; লেনিন এইজন্যই মরিয়াও বাঁচিয়া আছেন।

ধ্বংসের কথায় তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন—"We have not only cut off heads, we have also enlightened new heads, many heads."

"মুণ্ডপাত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত নই; নূতন মাথায়, অনেক মাথায় আলোও ভরিয়া দিয়াছি।" শিক্ষার কথায় বলেন—"I grant that illiteracy was useful when it was a question of demolishing merely for the sake of destruction. We are destroying in order to build up something better..." "ভাঙ্গার জন্য ভাঙ্গাই যখন প্রয়োজন ছিল, তখন শিক্ষা বন্ধ রাখা নিরর্থক হয় নাই, স্বীকার করি; কিন্তু আমরা ধ্বংসব্রতী, আরও কিছু ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই।"

আমরা দেখি—রুশের পার্ল্যামেণ্ট-সভায় শ্রমিকের বিগ্রহ-রূপে লেনিন যেদিন দেশশাসনের রাজদণ্ড ধারণ করিলেন, সেইদিন হইতেই যেন এক স্বপ্ন-মন্ত্রে রুশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, মূক মৌন শ্রমিকেরা সচেতন হইয়া সেই রাজ্যশাসনের অধিকারী হইয়া উঠিল; তাহারা অভিনব রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়িয়া তুলিল। যে শক্তি এতদিন রুদ্ধ ছিল,

তাহার দুয়ার মুক্ত হওয়ায়, তাহারা প্রচণ্ড শক্তিপ্লাবনে অভিষিক্ত হইল—এক বীভৎস পশুবলদৃপ্ত রাজশক্তির সৃজন করিল। যাহাদের মুখে এতদিন কথা বাহির হইত না, প্রবলের, অভিজাত-শ্রেণীর সঙ্কেতে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিত, তাহারা একটা নূতন সমাজনীতির সন্ধান পাইল—রুশের ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মমন্দির চূর্ণ হইল, ঈশ্বরবিশ্বাস পলায়ন করিল। লেনিন সগর্ব্বে বলিলেন—"And God-creation—is not this the worst form of self-reviling? Every man who occupies himself with the construction of a God, or merely even agrees to it, prostitutes himself in the worst way, for he occupies himself not with activity, but with self-contemplation and self-reflection and tries therefore to deify his most unclean, most stupid and most servile features of pettinesses."

বাইবেলে যে সয়তানের কল্পনা করা হইয়াছিল, তার মুখেও এমন কথা বাহির করিতে কবি ভরসা করেন নাই; তবে রুশ যে সয়তানের রাজ্য নয়, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াও যে রাজ্য গড়া যায়, শক্তি-প্রকাশ হয়, রুশের বিপ্লবে তাহা যেন আজ আর অস্বীকার করা যায় না—ইহা এক নূতন আদর্শ, নূতন সভ্যতা বলিতে হইবে। লেনিন কি ভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

উপরোক্ত কথাগুলির মর্ম্মানুবাদ হইতেছে—"এই একটা ঈশ্বর-সৃষ্টি—নিজেকে অপদার্থ করিয়া তোলার ইহা কি জঘন্যতম পথ নয়! একটা ভগবান সৃষ্টি করার কাজে যে ব্যক্তি লাগিয়া আছে, অথবা যাহার

ইহাতে সমর্থন থাকে, তার মত ঘৃণ্য ব্যাভিচার আর কেহ করে না। আত্মচিন্তায় আপনারই ছায়াচ্ছন্ন হইয়া সে কর্ম্মবিরত হয়; আর এই জন্য সে তাহার অতি কুৎসিৎ নিরেট মূর্খতা এবং কদর্য্য দাসভাব বা সঙ্কীর্ণতাকে দেবতার আসনে উঠাইয়া পরিতৃপ্তি পায়।"

লেনিনের আরও একটী বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াই শেষ করি—যাহার জন্য তিনি সমগ্র ইউরোপের শত্রু। ইউরোপীয় সভ্যতা ও আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি রুশকে এক অভাবনীয় আকারে গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান ইউরোপের ধন-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের রুশ হইতেছে মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদ। সমাজতন্ত্রবাদের যে স্বপ্ন কার্লমার্ক্‌স কেবল কল্পচক্ষে দেখিয়া বিভোর হইয়াছিলেন, লেনিন তাহার মূর্ত্তি দান করিয়াছেন; কিন্তু ইউরোপের সভ্যতা তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করার পক্ষপাতী নহেন। ইউরোপের যে দান রুশের আদর্শকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতে চাহেন। এই দিক্ দিয়া জার পিটার-দি-গ্রেট রুশ-রাণীকে ঐশ্বর্য্যশালিনী-বেশে দেখার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার যে কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে, লেনিন সেই অসমাপ্ত কার্য্যই তাঁর শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রবল শক্তির সাহায্যে ঝড়ের মত সুসিদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত নহেন—ইহাই সংক্ষেপতঃ রুশের অতি-মানুষ লেনিনের অমর চরিত্র ও কীর্ত্তি।

ইউরোপে আর একজন শক্তিশালী অতি-মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। ইটালী ইউরোপের রণরঙ্গে কোন মতে নামিতে চাহে নাই; কিন্তু প্রাচীন রোমের গৌরবপূর্ণ ও মহিমাময় স্বপ্নে বিভোর এক বীর ও এক উন্মাদ যোদ্ধৃকবি ইটালীকে এই আহবে যোগদান

করাইয়াছিলেন—জগৎপ্রসিদ্ধ বেনিটো মুসোলিনী ও দা' আন্নুন্‌জীও। আমরা মুসোলিনীর কথারই সামান্য আলোচনা করিব।

ইউরোপের সমাজতন্ত্রবাদই আজ নানা আকারে নব নব আদর্শ লইয়া দেখা দিতেছে। মুসোলিনীও একজন সমাজতন্ত্রবাদী কর্ম্মকারের সন্তান। ইটালীর ফোর্লিদেশে ইঁহার জন্ম। ইতালীর 'গণতন্ত্রবাদ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। নির্ব্বাচনঘটিত ব্যাপারে মুসোলিনী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন; তারপর কিছু দিন সুইজারল্যাণ্ডে বাস করিয়া জন্মভূমি ইতালীতে ফিরিয়া আসেন। সমাজতন্ত্রবাদীদের চরমপন্থী দলে থাকিয়া ইতালীকে নূতন ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি সংবাদপত্র-পরিচালনায় কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। তারপর ইতালীর বৃহৎ স্বপ্ন সিদ্ধ হওয়ার আশায় মহাযুদ্ধে ইতালী মিত্রপক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে; কিন্তু যুদ্ধশেষে 'মাইনরিটীর সেফগার্ড' দেখিতে গিয়া উইলসনের বিচারে ইতালী ডালমেটিয়াও পাইল না, ফিউম পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যবিস্তার-কামনাও চরিতার্থ হইল না—ইতালী আহত সর্পের ন্যায় মর্ম্মজ্বালায় অন্তরে অন্তরে গর্জ্জিয়া উঠিল। মুসোলিনী সেই ব্যথার ভার মাথায় করিয়া একদিন হঠাৎ ৫০০০০ হাজার নরনারী সঙ্গে লইয়া রোম-নগরীতে অভিযান করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্নুয়েল সেদিন যদি এই বিপ্লবদমনে অস্ত্রবল ব্যবহার করিতেন, সে ক্ষেত্রে লেনিনের প্রথম প্রচেষ্টার ন্যায় মুসোলিনীরও লোকবল ছন্নছাড়া হইয়া পড়িত; কিন্তু ইতালীর বিচক্ষণ নরপতি মুসোলিনীর পশ্চাতে ইতালীর সত্তাকে নিরীক্ষণ করিলেন—তিনি একপ্রকার এই যুগপুরুষের হাতেই রাজদণ্ড তুলিয়া দিলেন। এই দিন ইতালীর মুখে বজ্ররবে ফ্যাসিষ্ট-নেতার ঘোষণা বাহির হইল—"Our] programme

is simply that we mean to govern Italy." "আমাদের কাজ কেবল ইটালীকে সুশাসন করা।"

রুশের বলশেভিজম্ জানিতে হইলে যেমন লেনিনকে বুঝিতে হয়, মুসোলিনী ইতালীতে যে "ইজিম্' বাহির করিলেন, সেই 'ফ্যাসিসিজম্' তাঁহাকে না জানিলে তেমনি বুঝা যায় না। আমরা মুসোলিনীর মতবাদের বিশদ বিবরণ দিব না; তাঁর চরিত্রাঙ্কনটুকু করিয়াই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

মুসোলিনীর আদর্শবাদ আজ ইউরোপের মনীষিবৃন্দ অস্বীকার করিলেও, মুসোলিনীকে অতি-মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছেন। ইউরোপের রাক্ষসী শিক্ষা-সভ্যতার আবর্জ্জনা-স্তূপ সরাইয়া লেনিনের মতই তিনিও এক অভিনব আদর্শ ও সভ্যতার বেদী রচনা করিয়াছেন। তিনি আজ ইটালীবাসীদের জীবনধারা নূতন পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তাদের নবজন্ম দান করিয়াছেন, তাহাদের মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, সমগ্র চরিত্রের আমূল রূপান্তর হইয়াছে। মুসোলিনীও বড় বড় ভাবের কথা লিখিয়া, বলিয়া শুধু স্বপ্নদ্রষ্টার আসন গ্রহণ করেন নাই—ইটালীর নরনারীর সহিত একত্র হইয়া তাঁর আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়াছেন; লিটল্ ওয়াসবর্ণ চাইল্ড—আমেরিকার রাজদূত বলেন—"......Mussolini has *made* a state, that is super-statesmanship.". "মুসোলিনী একটা আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কার্য্য রাষ্ট্রনীতির চেয়ে অতিমানুষিক মহানীতিই বলা উচিত।"

কার্লমার্ক্স বলিয়াছিলেন—এক টন থিয়োরীর চেয়ে এক আউন্স কর্ম্মসিদ্ধি বড়। লেনিনের মত মুসোলিনীও কৃতকর্ম্মা বীরপুরুষ।

তিনি নিজেই বলেন—"The sanctity of an 'ism' is not in the 'ism', it has no sanctity beyond its power to do, to work, to succeed in practice. It may have succeeded yesterday and fail to-morrow. Failed yesterday and suscceed to-morrow. The machine first of all must run." ইহার মর্ম্ম, "'ইজিমের' ভিতর বড় কোন বস্তু নাই ; ইহা করা, কার্য্যে পরিণত করা, ফলপ্রসূ করিয়া তোলাই ইহার আসল কথা। গতকল্য ইহার সাফল্য দেখা গিয়াছে, কাল আবার ব্যর্থ হইতে পারে, অথবা গতকল্য ব্যর্থ হইয়াছে, কাল আবার সফল হইবে—ইহা কিছু নয়, কর্ম্ম-যন্ত্র অবিরাম চলিবে।" লেনিন ও মুসোলিনীর যেন একই প্রকৃতি।

লেনিনের ন্যায় সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপাইয়া লইতেও মুসোলিনী কাতর নহেন ; জাতির সমস্ত সমস্যাই তিনি বহন করেন। সমাধানের পথে যখন পা বাড়াইয়া দেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে ভরসা করেন না—সে অব্যর্থ লক্ষ্য কোথাও ভ্রষ্ট হয় নাই। তাঁহার বাণী—"work and discipline." "কাজ কর, সুশৃঙ্খলিত হও।"

মুসোলিনীর কর্ম্মশক্তি যদি কোথাও রুদ্ধ হয়, সেখানে তাহা ফুলিয়া ফুলিয়া বাধাকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে ; সংগ্রাম মুসোলিনীর ক্রীড়াক্ষেত্র—খেলিতে খেলিতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মহাকলরব উঠে, বিশ্ব স্তম্ভিত হয়! ইটালীর শাসননীতি যত কঠোর হয়, ইটালীবাসীর কণ্ঠে ততই আনন্দ-ধ্বনি উঠে—ইটালীর ইহাই আজ জয়যাত্রা।

বীরের মুখেই এই বাণী বাহির হয়—"......I could not understand why it is necessary to take time in order to act." "কাজের জন্য মানুষের চিন্তা করিবার কি আছে, আমি বুঝি

না।" "My day began and ended with an :act of will, by will put into action." "একটা প্রবুদ্ধ ইচ্ছা লইয়া আমার দিনের আরম্ভ ও শেষ, এই ইচ্ছাই কর্ম্মে পরিণত হয়।"

মুসোলিনী ইটালীর অন্তরে কর্ম্মবীজ ছড়াইয়া দিবার জন্য যে বাণী-প্রচারে উদ্যত হইলেন, সে বাণী ইটালীবাসীর প্রাণের কথা হইয়াছিল; নতুবা দেখিতে দেখিতে তাঁহার পত্রিকার এক লক্ষ গ্রাহক হইবে কেন!

মুসোলিনী অতীন্দ্রিয় জগতের সাড়ায় বিশ্বাস করেন; তিনি নিজেই বলেন—"যখন আমি কিছু চরম সিদ্ধান্ত করি, তখন অন্তরিচ্ছার আজ্ঞাই শুনি, ভিতর হইতেই বিবেকের বজ্রগর্জ্জন উঠে।"

মুসোলিনী ইটালীর ভাগ্যবিধাতা; কিন্তু দারিদ্র্যব্রতধারী স্ত্রী-পুত্র লইয়া অতি দীনভাবে জীবনযাপন করেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে দুইটী বিষয়ের প্রয়োজন সকলেরই হয়—সদ্‌গ্রন্থ ও সুশিক্ষক। জীবনই আমার শাস্ত্র; প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই আমার গুরু।" ইটালীর নর-নারীর সহিত একাত্ম হইয়া তিনি ইটালীর বিশিষ্ট সত্তা ও বাণী অনুভব করেন। দেশাত্মবোধের পরিচয়স্বরূপ তাঁর এই বাণী মর্ম্মগ্রাহী —"I am desperately Italian. I believe in the function of Latinity." "আমি একজন গোঁড়া ইটালীয়ান; আমি লাটিন জাতীয়তার ভবিষ্যতে বিশ্বাসী।"

তিনি ফ্যাসিসিজমকে দল বলেন না—ইহা প্রগতি; জাতিকে স্বচ্ছন্দে সুনিয়ন্ত্রিত করার ইহা দিব্যযাত্রা—ইহা একটা নূতন সভ্যতার বেদী-গঠনেরই প্রয়াস।

ইউরোপে আজ তিনি দুইটা সভ্যতা-ধারার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন—সোভায়েট রুশের রক্তচিহ্নিত আদর্শবাদ আর রোমের

প্রাচীন কৃষ্ণ-পরিচ্ছদভূষিত আদর্শবাদ। লেনিনের উত্তেজনামূলক সভ্যতা পতনের যুগে উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হওয়া সংশয়-সাপেক্ষ। ইটালীর জীবন-বিপ্লবে নব আদর্শবাদের জয়ডঙ্কা বাজিয়াছে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও রণদামামার কণ্ঠ ছাড়া এ বাণী পৃথিবীর কাণে পৌঁছাইয়া দেওয়া বুঝি সম্ভব নহে।

মুসোলিনীর আত্মবিশ্বাস এমনই দৃঢ়, যে কোথাও প্রশ্রয়, কোথাও আপোষের পক্ষপাতী তিনি নহেন। আপনার অভ্রান্ত মত লক্ষ্যে রাখিয়া নির্ভীকযাত্রায় বাধাকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না; তিনি চাহেন —"A solidified Nation—dominated, inspired and spiritualised by Fascism. I am not the judge of that; the world is." "'ফ্যাসিসিজমের' প্রভাবে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, অধ্যাত্ম-শক্তিসমন্বিত দৃঢ়সংহতিবদ্ধ জাতি", আর ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার বিচারের ভার জগতের উপরই দিয়াছেন। জাতি-নির্ম্মাণের পথে দল ভাঙ্গিয়া যায়, ক্ষতি নাই; দেশ রক্ষা হউক। রোমের সভ্যতা ও আদর্শ নবজীবন লইয়া জাগিয়া উঠুক—ইহাই মুসোলিনীর প্রাণের কথা।

এই ফ্যাসিসিজম মানব-চরিত্রে রাষ্ট্রনীতিকে জীবনে পরিণত করিয়াছে। ইহা বিশ্বাসের ব্রহ্মাস্ত্র হইয়াছে। ইহা যুগ যুগের সেই ধর্ম্মপ্রাণ, যাহা দিয়া পতিত জাতি আবার নূতন হইয়া আত্ম-মহিমা ঘোষণা করে। ইহা সেই শক্তি, যাহা জাতির জীবন গ্লানি ও ক্লেদে পূর্ণ হইলে স্বতঃই অভ্যুত্থিত হয়, জাতিকে নিরাময় ও সুন্দর করিয়া তুলে, জাতি নবজন্ম লাভ করে। মুসোলিনী ধ্বংস-যজ্ঞের রুদ্র-পুরোহিত হইলেও, লেনিনের ন্যায় তাঁর মধ্যেও সৃষ্টির বীজ নিহিত।

তিনি নিজেই বলেন—"......The poetry of my llfe has become the poetry of construction." "আমার জীবন-সঙ্গীত আজ সৃজনের সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে।"

মুসোলিনীর জীবনাদর্শ ইটালীর ব্যক্তি ও জাতিকে জীবনের উচ্চতর আদর্শের ক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিয়াছে। রুশের নেতা একটা পতিত জাতিকে জোর করিয়া টানিয়া, আপনার অখণ্ড প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া, খাড়া করিয়া দিয়াছেন; বাঁচিবার পথে যত বাধা, ভীমপদে চলিয়া চলার নীতি দিয়াছেন। ইটালীর মুসোলিনী একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতি গড়িতে চান—শুধু রাষ্ট্রে নয়, সমাজে; ইউরোপের ভুয়া গণতন্ত্রবাদ ও লঘু তরল প্রগতিবাদ রোধ করিয়া, ইহার পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি দিতে প্রয়াসী। তিনি নিজেকে ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া গর্ব্ব করেন; এই গর্ব্বের মধ্যে বিনয়ের অভিনয় নাই, উলঙ্গ সত্য—তাই তাঁর আজ্ঞা, অত্যাচার জাতি মাথা পাতিয়া লয়। মুখোস-পরা বিশ্ব-প্রেমিক, ভণ্ড গণতন্ত্রবাদীর আচরণ আজ যে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; অশান্তির আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে—স্বার্থের জন্যই নহে, কেবল পেটের জ্বালা নিবারণ করিতে নহে—জগৎটা আজ সত্যের সন্ধানে মাতালের ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; সে বিশাল ঐরাবতের চরণ-চাপে অনেক কিছু বিমর্দ্দিত হইবে। রুশের পর ইটালীতে মুসোলিনীর অভ্যুত্থানে যেন বিশ্বশক্তিকে কতকটা প্রশান্ত, স্থির হইয়া যুগের আদর্শ বরণ করিতে প্রকৃতিস্থ হইতে দেখি।

আসলে রুশকে যেমন আমরা দেখি, জগতের একাংশকে হাতের মুঠায় লইয়া অন্য অংশের উচ্ছেদসাধনে উদ্যত, প্রতিক্রিয়া-শক্তির রুদ্রমূর্ত্তি; ইটালীতে ইহারই প্রতিবাদ-স্বরূপ ফেসিসিজম্। নিজের

জাতিকে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ করিয়া বিশ্বের সম্মুখে একটী নিখুঁত আদর্শ-জীবনস্থাপনের অভিলাষী রুশও শূদ্রজাতির উত্থান-কামনায় একনিষ্ঠ; শূদ্র ব্যতীত আর কিছুর কল্পনা ছলনা বলিয়াই মনে করে। মুসোলিনী শ্রমিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রোমের গরিমা-রক্ষায় তৎপর; ইহা যেন এক স্তর হইতে অন্য স্তরে শক্তির লীলামাধুরী। কিন্তু রুশের শেষ এখনও দেখা যায় নাই। ইটালীর ভাগ্যাকাশে এই মাত্র অরুণবর্ণে নূতন তপনের উদয়। ইউরোপের সভ্যতা ও আদর্শের ভাঙ্গন ধরিয়াছে—রুশ ও ইটালীর অভ্যুত্থানে ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়; কিন্তু সেই বিশাল সভ্যতা এই উভয়কে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়া পরিণামে এক অখণ্ড-সত্যের প্রস্তুতিরূপেই ইউরোপে মাথা তুলিবে—ইহা পশ্চিম ইউরোপের মনীষিবর্গের ধারণা।

প্রাচ্যে আর একজন অতি-মানুষের অভ্যুত্থান পরিদৃষ্ট হয়। ছিন্নভিন্ন বিপন্ন জাতি-প্রাণ মুঠার মধ্যে ধরিয়া লেনিন যেমন নূতন রুশের নির্ম্মাতা, ইতালীকে নবজন্ম দিয়া মুসোলিনী যেমন নূতন আদর্শের বিশ্বকর্ম্মা, তুর্কজাতিকে সেইরূপ নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া, প্রাচ্যের কামালপাশা এক অক্ষয় কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তুর্করাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রতিভা ও শক্তির তুলনা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ নাই।

কামালও তুর্কভূমির পূর্ব্ব-গৌরবের পুনরুদ্ধার-মানসে মাথা তুলিতে গিয়া রাজশক্তির হস্তে নিপীড়িত লাঞ্ছিত হইয়া এঙ্গোরায় নির্ব্বাসিত হন। কিন্তু ইউরোপের সংগ্রাম শেষ হইলে লুব্ধ গ্রীস অন্তর্বিদ্রোহে বিপন্ন তুর্ককে গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়; এই সময়ে কামাল লক্ষ

বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখে জর্ম্মনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২৫০০০ হাজার জাতীয় সেনা লইয়া ইহার গতিরোধ করেন। "পাথারিয়ার" সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী কামালকে বরণ করিয়া লন। গ্রীসের সেই পলায়ন চরম প্রস্থান হইয়াছে; পশ্চিম এসিয়ায় তার অধিকার-প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে।

কামাল ইহার পরেই এঙ্গোরায় জাতীয় সঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লইয়া বাঁচিতে চাই, "......we demand only that Europe make no attempt aganist our national rights." "আমাদের এই জাতীয় অধিকারে ইউরোপ যেন হস্তক্ষেপ না করে।"

তুর্কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল না, এঙ্গোরার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সমগ্র তুর্কের উপর অধিকার স্থাপন করিল, কামালের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া জগৎ 'ধন্য ধন্য' করিল। তারপর তিনি তুর্ক-জাতিকে নূতন করিয়া গড়ার আয়োজন করিলেন। সে গঠনের ভিতর নূতনের কোন সন্ধান নাই; বরং ইউরোপের আদর্শ ও সভ্যতার ছাঁচে দেশকে ঢালাই করিয়া, ইউরোপের ন্যায় বীরের মত দেশের আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থায় মনোযোগ দিলেন। প্রাচীন তুর্কের সভ্যতা ও আদর্শের পঙ্কোদ্ধার করিয়া যেমন ইহার রূপান্তর-সাধনে তাঁর প্রতিভার সাড়া উঠিল না, সেইরূপ সোভিয়েটের ন্যায় কোন নূতন আদর্শবাদের সন্ধানও তাঁহার ভিতর দিয়া পাওয়া গেল না। যে খলিফাৎ-সমস্যায় ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া তিনি ইউরোপের মানস-পুত্ররূপে দাঁড়াইবার প্রয়াস করিলেন; তাঁর কথা ভারতের ইস্‌লামধর্ম্মিগণ বিস্ময় সহকারে শুনিল—"As

Mohammad broke the idols in Mecca and Medina, we also broke down these idols of Caliph, Madrasha and Muktabs." "মহম্মদ মক্কা ও মেদিনার মূর্ত্তি যেমন করিয়া ভাঙ্গিয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ খালিফা, মকতাব ও মাদ্রাসাগুলিকে গুঁড়া করিয়া দিব।" তিনি তুর্কস্থানকে ইউরোপের আদর্শে গড়ার জন্য তাহার প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়াছেন। আমরা কামালপাশার অসাধারণ চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করি; কিন্তু মুসোলিনী ও লেনিনের সঙ্গেই মহাত্মাকে বিচার করিব। কামালপাশার আত্মবিশ্বাস ও বীর্য্য এক দিক্ দিয়া এই সকল মহাপুরুষগণের তুল্য বলিতে হইবে; কিন্তু আদর্শের দিক্ দিয়া মহাত্মার সহিত লেনিন ও মুসোলিনীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

রুশের যে অবস্থায় লেনিনের অভ্যুত্থান, ভারতের অবস্থা তাহার অপেক্ষা খুব যে ভাল তাহা নহে; বরং রুশ ইউরোপের অন্তর্গত বলিয়া তাহার জাতীয় উত্থানের সুবিধা অধিক ছিল। ভারতেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জাতি জাগিতে চাহিতেছিল যাঁহাদের কথায়, তাঁহারা ঠিক দেশাত্মার সহিত যুক্তি পান নাই; দক্ষিণেশ্বরে যে ভারতের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার পুনরুক্তি করিয়াই নেতৃবৃন্দ দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বার্ক, গ্ল্যাডষ্টোন, ম্যাজ্জিনী, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঋষিজনের বাণীর প্রতিধ্বনিই শুনা যাইত—জাতির মর্ম্ম-বীণায় কেহ ঝঙ্কার তুলিতে পারেন নাই। এই সময়ে অকস্মাৎ মহাত্মার আবির্ভাবে দেশ চমকিয়া উঠিল—যেন কি এক অপার্থিব শক্তির প্রভাবে কোটী কোটী নরনারী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করিল। তিনি সত্যকে ভাবে, ভাষায় রাখিলেন না, মূর্ত্ত করিয়া ধরিলেন—দেশ আপনার স্বরূপ চাক্ষুষ করিয়া ধন্য হইল।

আমরা লেনিনের মতই মহাত্মাকে জাতির মুক্তি-যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে দেখি; কিন্তু দুইজনের কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য দেখিয়া বিস্মিত হই। একজন কার্য্যসিদ্ধির প্রতিকূল শক্তিকে নিরন্তর উচ্ছেদ সাধন করিতে করিতে আগাইয়া যাইতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন; অন্যজন মানবাত্মার মুক্তি-পথে আত্মদর্শনের সনাতন বিধান দিয়া ইহা সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। পাশ্চাত্যের হিংসা-নীতি ভারতে যুক্তিযুক্ত নহে; তিনি ভারতের ধর্ম্ম-বলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এই পতিত জাতিকে তুলিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

লেনিন ও মুসোলিনীর ধাতু ও প্রকৃতির সহিত মহাত্মার সৌসাদৃশ্য আছে, কামাল পাশারও এই ক্ষেত্রে ভেদ দেখা যায় না। মহাত্মাও বাধার সম্মুখে বিচলিত নন। আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অতি বড় আত্মীয়কেও তিনি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন; যাহা অসঙ্গত, অসম্ভব তাহাই করিয়া বসেন, তাঁর প্রতি অনুরক্তজনের যুক্তি বা সঙ্গতবাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না; মুসোলিনীর মত নিজেকে, সংহতিকে, দেশকে জড়াইয়া এমন অন্ধকারের মধ্যে নিজের উপর সকল দায়িত্ব লইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া পড়েন, যে সকলে—এমন কি, তাঁর সহকর্ম্মীরাও অনেক সময়ে আলো দেখিতে পান না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রের মনেও একদিন তাঁর আচরণে সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন—"......Everywhere I was told that culture and reasoning power should abdicate, and blind obedience only reign. So simple it is to crush, in the name of some outward liberty, the real freedom of the soul." "সর্ব্বত্র শুনা গেল, যে বিচার-শক্তি ও শিক্ষা-সাধনার

যুগ আর নাই, অন্ধ বাধ্যতার যুগ আসিয়াছে। বাহ্যমুক্তির নামে, প্রকৃত আত্মার স্বাধীনতা দাবিয়া রাখা এতই সহজ!"

মুসোলিনীর "work and discipline" মহাত্মার জীবনেও মূর্ত্ত; কিন্তু তাহা রাষ্ট্রশক্তিলাভের আদর্শে ও প্রভাবে নয়, আত্মার শক্তিতে। রুশের অবনত জাতি লেনিনের জন্য আত্মাহুতি দিতে জাগিয়াছিল; তাহাদের ভোগ ও অধিকারবাদ এই ব্যক্তির মধ্যে সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু ভারতের প্রাণ মহাত্মা জাগাইলেন—ভোগ ও অধিকারবাদের প্রলোভনে নয়, ভারতের সনাতন ধর্ম্মে, ফলাসক্তি-ত্যাগের আদর্শে; ভারত আত্মস্বরূপের সন্ধান পাইল—স্বার্থশূন্য হইল।

লেনিন-মুসোলিনী নূতন স্বপ্ন দেখিয়াছেন। লেনিনের স্বপ্ন পুরাতনের সম্পর্কবর্জ্জিত; মুসোলিনী তাঁহার রোমরাজ্যের অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার-কামনায় জাতিকে "Latinity"তে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে চাহেন। লেনিনের জগৎ শ্রমিকের ক্ষেত্রে, মুসোলিনীর ইটালীতে; মহাত্মার প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মে, হিন্দুত্বে—সে হিন্দুত্ব সত্যরক্ষায়। দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে সত্যরক্ষার নীতি তিনি পালন করিতে বলেন; দেশের হিতসাধনের নামেও মিথ্যার চাতুরী না প্রবঞ্চিত করে। তিনি "ডিপ্লোমেসি" মিথ্যারই নামান্তর মনে করেন। যেখানে অসত্য, সেখানে শাস্তি—প্রায়শ্চিত্ত। দেশের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব অর্থে তাঁর কাছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা মাত্র নয়, জাতির অন্যায়, অসত্যের প্রায়শ্চিত্ত করার দায়িত্বও তিনি বহন করেন, ইহা অভাবনীয় অপূর্ব্ব চরিত্র নহে কি!

তাঁর অহিংসা-ব্রত—ইহাই তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষকে জয় করার ব্রহ্মাস্ত্র।

উহা কেবল প্রাণ-হিংসা নয়; যাহাকে অত্যাচারী বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি, তাহাকে কোনরূপ আঘাত না দেওয়া। তাহার প্রতি রুষ্ট হইলেও চলিবে না, ভালবাসিতে হইবে। তিনি অত্যাচার দুর্নীতির বিরুদ্ধাচারী হইতে বলেন; কিন্তু অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে কোন মতে আঘাত দেওয়া তাঁর ধর্ম্মনীতি নয়। প্রেমের দ্বারাই তিনি জয় চাহেন। নির্য্যাতিত হওয়া, দুঃখ ক্লেশ ভোগ করা, এবং মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ইহাই মহাত্মার আদর্শপ্রতিষ্ঠার পথ, উপায়।

এই সকল নীতি অচল, উন্মাদের কল্পনা বলিয়া লোক হাসিয়া উড়ায়; কিন্তু যত দিন যায়, আত্মিক-শক্তির এই সকল দিব্যাস্ত্র যে নিষ্ফল নহে, ইহা যেন মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করিতেছে।

লেনিন ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে, মুসোলিনী প্রাচীন রোমের আদর্শ ও সভ্যতার রক্ষণে, সর্ব্বদা ইউরোপের বর্ত্তমান অন্যান্য "ইজিমের" অভিযাত্রার পথ রোধ করিয়া অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত। ইটালীর ত্রিসীমানায় বিরুদ্ধপক্ষ আসিয়া উঁকি মারিলেই গুলি চলিবে; রুশ বিপক্ষকে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিবে, ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে। মহাত্মা তাই বলেন—"All—be they Nationalists, Fascists, Bolshevists, members of the oppressed classes, members of the opposing classes claim that they have the right to use force, while refusing this right to others." ইহা যে কত বড় সত্য কথা, তাহা প্রত্যেক জগদ্বাসীর প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ "জাতীয়পন্থী, ফ্যাসিষ্ট, বলসেভিষ্ট, নিপীড়িত জনবর্গ, আর রাজ্যবলদৃপ্ত নিপীড়নকারিগণ, সকলেই পশুবল-ব্যবহারের প্রয়োজন দাবী করে; অথচ একজন অন্যজনকে সে অধিকার দেয় না!" অর্দ্ধ শতাব্দী

পূর্ব্বে, "Might is right" কথাটার অর্থ ছিল, এখন "Might has devoured right"—মানুষের অধিকার ইহাতে ক্ষুন্ন হইয়াছে।

আজ ভারতে মহাত্মা গান্ধী যে আদর্শ ও সভ্যতার জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়। পাশ্চাত্যের সভ্যতা শুধু ভারতের শত্রুতাসাধন করে নাই, ইংরাজেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইংরাজকে দূর করিয়া যাহারা ভারতকে পাশ্চাত্যের মত করিয়া গড়ার অভিলাষী, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা বলেন—"Having the nature of a tiger without the tiger." "বাঘের স্বভাব চাই, ব্যাঘ্রত্বকে বর্জ্জন করিয়া!" তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আগাগোড়া বর্জ্জন করিতে চাহেন—ভারতের জন্যই নয়, মানবকল্যাণ তাঁহার লক্ষ্য।

মহাত্মা যন্ত্রযুগকে জাতির জীবনে বিষের ন্যায় অপকারী মনে করেন; অনুকরণ মায়া বলিয়া উপেক্ষা করেন, জলদ-গর্জ্জনে বলেন—"She has nothing to learn from other nations. ......India must go back to the sources of her ancient culture." "ভারত কোন জাতির নিকট কিছু লইতে চাহে না, সে তার প্রাচীন সভ্যতার উৎস-মূলে ফিরিয়া যাইবে।"

সনাতন ভারত বলিয়া যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাস এই কথায় যে কি পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তিতে তাঁর মাঝে বর্ত্তমান, ইহা ভাষায় বলিবার নহে। ভারতের সেই অমৃত-বীর্য্য, যাহাতে অবগাহিত হইলে বিশ্ব-জ্ঞান-লাভ হয়, তাহা ভাষা-রূপে মানুষের কণ্ঠে উদ্গান তুলে—কার্য্য-কালে চাহে, আদান প্রদানে উভয়ের মিলন, ইহা হাস্যকর কথা! ভারত—বিশ্বকে ভরণ করিতে বিধাতার সৃষ্টি; যে সে ভারত-বীর্য্য পাইয়াছে, তাহার কণ্ঠেই এই ঋক্ উচ্চারিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বস্তু-জগতের দাবী

লইয়া বিশ্ব-বরেণ্য নন, পৃথিবীতে অমৃত দান করিতে তাঁর জন্ম। সে দান ভূমার দান; গান্ধীর চরিত্র দিব্য, কর্ম্ম দিব্য, ভাব ও আদর্শ দিব্য; নিখিল-মানব-বন্ধু গান্ধী—তাই আজ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। মিঃ লয়েড পরিহাস করিয়া মহাত্মার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"তাঁহাকে যে ক্ষেত্রে জীবন্তে সমাধি দেওয়া হইবে বিশ্বের চক্ষে তাহা মক্কারন্যায় মহাতীর্থে পরিণত হইবে।" মিঃ লয়েডের আর একটী কথা—"এই ক্ষীণ, শুষ্ক চিংড়ি মাছের মত দুর্ব্বল মানুষটী ত্রিশ কোটী নরনারীকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; ভারতের ভগবান—এই গান্ধী!"

আমেরিকার খৃষ্টান মিশনারী হোল্‌মস সাহেব বলেন—"I say it in all reverence, that I look on Mahatma Gandhi as Christ returned to earth......the soul of the Mahatma is the soul of Christ." "সসম্মানে আমি বলি, গান্ধীর দিকে চাহিয়া দেখি, যেন যীশুই আবার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন—যীশুর আত্মা ও মহাত্মার আত্মা একই।"

এত বড় কথা বুদ্ধ ব্যতীত আর কাহাকেও কেহ বলিতে ভরসা করে নাই। মহাত্মা জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ, ইহা আজ কে অস্বীকার করিবে?

প্রায়োপবেশন ও ব্রতোদ্‌যাপন

মহাত্মা সত্যকেই ভগবান বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন; তাঁর মুখে সর্ব্বদা এই কথাই শুনা যায়—

"রঘুকুল-রীতি সদা চলি আঈ:
প্রাণ যাঈ বরু, বচন না যাঈ।"

"মানুষের জীবন যায়; কিন্তু সত্য-বাক্য কোন যুগে ধ্বংস পাইবার নহে।"

তিনি গোলটেবিল-সভায় বলিয়াছিলেন—ভারতের অস্পৃশ্যজাতি যদি ধর্ম্মান্তরিত হয়, তাহা সহ্য করা যাইবে; কিন্তু তাহাদিগকে আজ অখণ্ড হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা হইলে, তিনি ইহার প্রতিবাদ করিবেন; সে প্রতিবাদ নিজের প্রাণ দিয়াই করিতে হইবে। প্রাণের উপর মহাত্মার যে দরদ, তাহা অনন্যসাধারণ। তিনি বিশ্বাস করেন—ভারতের যে দেয় আছে, তাহা ভারতবাসীকেই দিতে হইবে; তিনি বিশ্বাস করেন—অন্তর্য্যামীর যে বাণী তাঁর অন্তরে অনাহত ধ্বনি করে, তাহার অনুসরণ করিয়া ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে তাঁহাকে পূর্ণাহুতি দিতে হইবে। এইজন্য তাঁর প্রাণের মূল্যও কতখানি তাহা তিনি ভাল করিয়া জানেন; কিন্তু বিলাতের গোলটেবিল সভায় তাঁর মুখ দিয়া যে সঙ্কল্প-বাণী বাহির হইয়াছে, বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলী তাহা যদি কেবল রাজনৈতিক ভূয়া কথাই মনে করেন; ইহার

প্রতিকারে যত্নবান্ না হন, মৃত্যুই তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে। অতএব ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই তিনি ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ও প্রধান-মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের সহিত পত্র ব্যবহার করেন।

১১ই মার্চ্চ যারবেদা জেল হইতে স্যার সামুয়েল হোরকে মহাত্মা জানাইলেন; "বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে, লণ্ডনে আমার বক্তৃতা-শেষে বলিয়াছিলাম—অনুন্নত সম্প্রদায়কে পৃথক্ নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইলে আমি আমার জীবন দিয়া তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিব। ......এই সত্য-রক্ষার জন্য প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" তাঁর এই কথা যে সাময়িক উত্তেজনা-বশতঃ নহে অথবা কথার কথা নহে, ইহা ভাল করিয়াই বুঝাইলেন। আরও জানাইলেন, যে অনুন্নত হিন্দু-সমাজকে প্রাচীনকাল হইতে অধঃপতিত করিয়া রাখায় জাতি-হিন্দুর যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; কিন্তু তাহাদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দিলেও ইহার কোন প্রতিকার হইবে না, বরং ইহাতে সমগ্র হিন্দু সমাজই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিনষ্ট হইবে।

ভারত-সচিব ১৩ই এপ্রেল মহাত্মাকে জানাইলেন—"লর্ড লোথিয়েনের কমিটী শেষ মন্তব্য প্রকাশ না করিলে এই বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। যথা-সময়ে মহাত্মার মতামত চিন্তা করিয়া দেখা যাইবে।"

১৮ই আগষ্ট কমিউনাল এওয়ার্ড বাহির হইল। অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার তাহাতে দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া মহাত্মা প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবকে ১৩ই নভেম্বর সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে গোলটেবিল-সভায় তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া জানাইলেন—"জীবন-পণেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইল।" তবুও তিনি

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিবার অবসর দিয়া বলিলেন—"২০শে সেপ্টেম্বর গভর্ণমেণ্টের মত-পরিবর্ত্তন না হইলে ঐদিন মধ্যাহ্ণ হইতেই আমি অনশন আরম্ভ করিব, লবণ ও সোডা সহ জল অথবা কেবল জল ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করিব না।"

তিনি নিরুপায় হইয়াই ইহা করিতে বাধ্য হইলেন; কেননা সত্যকেই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সত্য-রক্ষার দায়ে ইহা ব্যতীত তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। প্রধান মন্ত্রী কিন্তু মহাত্মার গভীর মর্ম্মকথা হৃদয়ঙ্গম করিলেন না। যুক্তিবাদী জগৎ তাঁহার এইরূপ জিদ্ অকারণ ও অসঙ্গত বলিয়া উপেক্ষা করিল। মিঃ র্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড শাসক-সুলভ কড়া কথায় স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন—"বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুন্নত সম্প্রদায়কে হিন্দু সম্প্রদায়ের অঙ্গ-বিশেষ বলিয়াই স্বীকার করে ......উপস্থিত দশ বৎসরের জন্য প্রধান সম্প্রদায়ের সহিত এইরূপ অঙ্গীভূত থাকিয়া কতিপয় বিশেষ স্থানে উহাদের নিজ নিজ স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। ......আপনার মনোভাবে বুঝিতেছি, অনশনের উদ্দেশ্য অনুন্নতদের যুক্ত অধিকার বা হিন্দু জাতির ঐক্য-রক্ষা নহে, অনুন্নত শ্রেণী যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় নিজ স্বার্থ-সংরক্ষণের সুবিধা না পায়, উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে না পারে, ইহাই আপনার চাওয়া......" খুব বিজ্ঞের ন্যায় শেষে বলিলেন—"এইরূপ সঙ্কল্প-গ্রহণের কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না; ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আপনি এইরূপ দুরাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।" উপসংহারে খুব জোর গলায় তিনি বলিলেন—"......অতএব ইহা বজায় থাকিবে; তবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে যদি খাঁটী আপোষমূলক রফা হয়, ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে।"

কে জানিত, নিখিল হিন্দুসমাজ ভারতের অনুন্নতদের বুকে টানিয়া লওয়ার জন্য আজ সর্ব্বত্যাগী হইতেও প্রস্তুত হইয়াছে! বৃটিশ ভারতের দরদের চেয়ে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্মীদের দরদ কল্যাণপূর্ণ ও অমৃতময়—কিন্তু আম্বেদকার প্রমুখ অস্পৃশ্যজাতির কর্ণধারগণ মহাত্মার এই মৃত্যুপণ সেদিন হাসিয়া উড়াইলেন।

মহাত্মার অনশন আরম্ভ হইল। তাঁর বজ্রকণ্ঠে পৃথিবী কম্পিত করিয়া বাণী বাহির হইল—"সত্যরক্ষার জন্য, সাতকোটী হিন্দুকে বহু শতাব্দী ধরিয়া অবনমিত করিয়া রাখার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমি প্রায়োবেশনে বসিলাম।"

অবিশ্বাসীর বাঁকা ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর হৃদয় উদ্‌বুদ্ধ হইল—সত্যের জয় দিতে। মহাত্মার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ অভাবনীয় মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইল। চির-সুহৃৎ বিঠলভাই লণ্ডন হইতে উৎকণ্ঠিত হইয়া জানাইলেন—"যে প্রাণ দলিত নিপীড়িত জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত, সে প্রাণ অকাতরে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করার অধিকার আপনার নাই, ...জীবন-ব্রত অসমাপ্ত, কোটী মানবাত্মা মুক্তির আশায় আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, এই অবস্থায় আপনার তিরোধান কর্ম্ম-বিরতির চেয়ে যে ভীষণ! অতএব এই সঙ্কল্পের পুনর্বিচার করিতেই হইবে।"

মহাত্মার অনুগত শিষ্য, সখা, সুহৃদ্ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য কাতর অনুযোগ জানাইলেন—তিনি একে একে সকলকে সান্ত্বনাপূর্ণ ভাষায় এই ভীষণ পণ-রক্ষার অনুকূলে আপনার মর্ম্ম-বাণী প্রেরণ করিলেন। শ্রীযুক্ত রাজগোপালকে লিখিলেন—"ইহাতে অসহায় বোধ করার কারণ কি! বরং আনন্দের হেতু

আছে। নিপীড়িত লাঞ্ছিতদের জন্য আত্মাহুতির শুভযোগ উপস্থিত, এই সম্বন্ধে পুনর্বিচারের কিছু নাই।"

ধনকুবের বিরলাকে লিখিলেন—"ভগবানের নামে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না।"

দেশ-বরেণ্য তেজ বাহাদুর সাপ্রুর অনুরোধের উত্তরে বলিলেন—"আপনারা মীমাংসার চেষ্টা করুন, সঙ্কল্প-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই; যদি সমাধান হয়, দেহভার উপবাসেও বহিতে পারিব।"

ভক্ত কৃষ্ণদাসকে লিখিলেন—"হয়তো এই শেষ পত্র। ভগবান অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছেন। আনন্দের কথা, দুঃখের নয়। এ মরণ-ব্রত অনুকরণের নয়; ভিতরের অভ্রান্ত বাণী না পাইলে, কেহ ইহাতে আগায় না।" রুদ্র-কণ্ঠে ভৈরব বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিল—

"মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, চীন কোন জাতিই মৃত্যুকে ভয় খায় না। মৃত্যু ইহাদের নিকট অতিশয় সাধারণ ঘটনা বলিয়াই প্রতীত। বস্তুতঃ ইহা কিছু নয়। মরণের ডাকে হিন্দু কেন বিমূঢ় হইবে, অসাড় নিস্পন্দ হইয়া পড়িবে!"

ইহাতো মরণের অভিযান নয়, প্রিয়তমের অভিসার। মহাত্মার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি—

"আব্বাস তায়েবজীর কন্যা স্তোত্র পাঠ করিলে আমার প্রায়োপবেশন আরম্ভ হইল। স্তোত্রটি তার স্বরচিত। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

শয্যা ত্যজ হে পথিক্
ওই হের রাত্রি অবসান।
পূরব দিগন্তে হের—
অরুণের দীপ্ত জয়গান।

প্রায়োপবেশন ও ব্রতোদ্‌যাপন

এখনও রয়েছ কেন

অলস সুষুপ্তি অবলীন।

মুগ্ধ নিদ্রা-কোলে যার

কেটে যায় জীবনের দিন—

দিবা শেষে সে দুর্ভাগা

ফেলিবে আকুল আঁখি-জল।

যে জন জাগিল তার

ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি সফল।

প্রভাতে আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হই নাই। অনশন-ব্রত আরম্ভ করিলাম। অশ্রুপাতের আশঙ্কা নাই; কেননা অন্ধকার আমায় প্রতিহত করিতে পারে নাই, এই দুর্গম পথে এই সান্ত্বনাই আমায় শক্তি দিবে।"

ভারতের হিন্দু প্রাণই এই মহাব্রত-পালনের লীলারঙ্গে চঞ্চল বিক্ষোভিত হইল না, নিখিল বিশ্ব হাহাকার করিয়া উঠিল। বিলাতে মহাত্মার শিষ্যা মিসেস লেষ্টার অসংখ্য নরনারী লইয়া লণ্ডনের পথে বিরাট্ শোভা-যাত্রায় বাহির হইলেন। ধর্ম্মযাজকেরা তাহাতে যোগদান করিলেন। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিলাতে মহাত্মার জয়ধ্বনি উঠিল। সুদূর আমেরিকা হইতে অবিচ্ছেদ প্রবাহে অনুকূল প্রতিকূল সাড়া পড়িয়া গেল। আমেরিকাবাসীর প্রশ্নে মহাত্মার উত্তর উদাত্ত কণ্ঠেই উচ্চারিত হইল, "আমার রাজনৈতিক মতবাদ আমার গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস-প্রসূত। বিধাতা যদি ললাটে অনশনে আমার মৃত্যুর বিধানই লিখিয়া থাকেন, মৃত্যুই আমার নেতৃত্বের অবসান আনিবে, আমার আত্ম-বলিদানে ভারতে জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে......অস্পৃশ্যের

জন্য আমার এই মৃত্যুপণ সারা ভারত-জাতির মুক্তিকল্পে মরণপণেরই রূপান্তর মাত্র।"

এইখানে অতি সন্তর্পণে গ্রন্থকারের পত্র-মর্ম্মের কয়েক ছত্র উঠাইয়া দিলাম, তার যোগ্য উত্তরের কয়েক ছত্র পাঠকদের উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই, গ্রন্থারম্ভে তাহা সমুদ্ধৃত করিয়াছি।

আমরা লিখিলাম......"what is destined will be–if you are really born with this mission to die and through the sacrifice of your priceless body, save the soul and life of Hinduism, none can baffle that pure yet heart-rending mission—none can stay the hands of cruel destiny. If so, then let the gushing blood of the best and the holiest on earth wipe out for ever the accumulated sin of ages, purify and rescue this nation. If on the other hand, it be life, immortal and invincible, whose breath of determination will serve only to sweep away like a tide the block of Himalyan size—that will be sufficient to demonstrate today that India lives to achieve a freedom which is not only political but the outburst of the soul itself–the soul of India fulfilling her noble mission to bless the whole world."

"সত্যই যদি মরণ-ব্রত লইয়াই আপনার জন্ম হইয়া থাকে, ঐ অপার্থিব দেহ দিয়া হিন্দুর আত্মা ও প্রাণ রক্ষা করাই আপনার ধর্ম্ম হয়, কে এই হৃদয়-ভেদী ঘটনার প্রতিরোধ করিবে? মহত্ত্বের রক্তে পৃথিবীর

সঞ্চিত কলুষ বিধৌত হউক ; আর তাহা যদি না হয়, অব্যর্থ অমৃতময় জীবনপ্রবাহে হিমালয়ের বাধা বিদূরিত হইবে ; ভারত দেখাইবে, তাহার উত্থান শুধু রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্যই নহে ; সে মুক্তি—আত্মারই প্রকাশ, বিশ্বকে কল্যাণ ও আশীষ দান করিবার জন্যই ভারত উঠিতেছে।" আমাদের মর্ম্মবাণীর এই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সেদিন তিনি মর্ম্ম দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইজন্য আমরা ধন্য হইয়াছি।

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ চিরযুগ মুমূর্ষু দেশবাসীর প্রাণে দুঃসময়ে যে অমৃত-রাশি ঢালিয়া দেয়, আজও তাহার অভাব হয় নাই ; সে নায়েগ্রাপ্রপাত বুঝি নিঃশেষ হইবার নহে। মুরলী ফুকারিয়া তিনি অমৃতের সঙ্কেতই দেশবাসীর প্রাণে আঁকিয়া দিলেন, বলিলেন—"যে মাটীতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ কর্‌ছি, সেই মাটীতে একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নাই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

তারপব, পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—"যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয় ; কেন না আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝ্‌তে কঠিন লাগে না—সেটি ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা এক রকম করে' বুঝতে পারি। সেই জন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘট্‌ল ; যে এবার বুঝেচি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেচেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেচি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেচে—তিনি আমাদের। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ নীচের ভেদ নেই, মূর্খ বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেচেন সকলের মধ্যে সমান-

ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেচেন—সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেচেন—শুধু কথায় নয়, দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েচেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস—দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেচেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেচে। দুঃখ—নিজের বিষয়-সুখের জন্য নয়, স্বার্থের জন্য নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার খেয়েচেন—উল্টে কিছু বলেন নি কখনো, কখনো রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে ধৈর্য্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হলো, কিন্তু জোর জবরদস্তিতে নয়; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেল্‌বার জন্য দেখা দিয়েচেন।

......তাঁকে জানে সকলেই; সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সমস্ত ভারতবর্ষ কি রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েচে, একটী নাম দিয়েচে—'মহাত্মা'। আশ্চর্য্য, কেমন করে' চিন্‌লে! মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোন মানে নেই; কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েচে, তার মানে আছে। তিনি মহাত্মা—... কেন না, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, সকলের স্থান তাঁর হৃদয়ে।"
বড় আকুল কণ্ঠেই মহাকবি প্রশ্ন তুলিলেন—

"খৃষ্টান শাস্ত্রে পড়েচি, আচার-নিষ্ঠ ইহুদীরা যীশুখৃষ্টকে শত্রু বলে' মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের? যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করলেও কি মার নয়?

সকলের চেয়ে বড় মার সেই। কি অসহ্য বেদনা অনুভব করে' তিনি আজ্‌কের দিনে মৃত্যু গ্রহণ করেচেন! সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে' না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মার্‌লুম না?" তারপর উদাত্ত আহ্বান মীড়ে মীড়ে ঝঙ্কার দিয়া দেশবাসীকে শুনাইলেন—"সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনা তাঁর বাণী। অনুভব কর—কি প্রচণ্ড তাঁর সঙ্কল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেচেন—দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন। তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে।......অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে—দেশের উপর। সেই জন্যে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে বসেচেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিল্‌তে হবে। সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন সুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সাম্‌নে ধর্‌লেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে।... গ্রহণ কর, সকলে ক্ষালন কর পাপ—মঙ্গল হবে। ......সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে—যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে; যদি সবাই বল্‌তে পারি, জয় হোক তপস্বীর, তোমার তপস্যা সার্থক হোক্। এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছিবে আর এক পারে—সকলে বল্‌বে, সত্যের বাণী অমোঘ, ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড় সার্থকতায় যে বাধা দেবে, সে অত্যন্ত হেয়; তাকে তোমরা ভয়ে যদি মানো, তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা। জয় হোক সেই তপস্বীর, যিনি এই মুহূর্ত্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সাম্‌নে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে' জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর—

তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছুক তাঁর আসনের কাছে; বলো—তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।

আমি কীই বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়? তিনি যে ভাষায় বলচেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার—মানুষের সেই চরম ভাষা নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌঁচেছে।”

কেবল মনীষী কবির সিদ্ধদৃষ্টিই সনাতনকে রূপ দিল না, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও বিচার ও যুক্তির জগৎ বিদীর্ণ করিয়া ভারত-ব্যবস্থাপক-সভায় শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—“যুগে যুগে যিনি ধর্ম্ম-রক্ষায় আসেন, তিনি আজ আসিয়াছেন,……তিনি বাঁচিলে আমরা বাঁচিব—তাঁকে হারাইলে আমরা বাঁচিব কি সুখে! (Who dies if Gandhi lives, who lives if Gandhi dies.)

মহাত্মার অনশন-যজ্ঞ অসংখ্য শিখা বিস্তার করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিল।

তারপর সমস্যাসমাধানের অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা। পণ্ডিত মালব্যের অসাধারণ শ্রম ও হৃদয়দানের পরিচয় পাইয়া আমরা সত্যই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। তিনি ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ হিন্দু-নেতৃদের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পরিশেষে ভারতের অনুন্নত হিন্দুসমাজের সহিত নিম্নোক্ত চুক্তিতে সমস্যার সমাধান করিলেন।

১। সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নোক্ত আসন বণ্টন করা হইবে—'

মাদ্রাজ—৩০; মধ্যপ্রদেশ—২০; বোম্বাই (সিন্ধু)—১৫;

আসাম—৭ ; পাঞ্জাব—৮ ; বাংলা—৩০ ; বিহার ও উড়িষ্যা—১৮ ; যুক্ত প্রদেশ—২২।

প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট মোট সংখ্যানুপাতের উপর ভিত্তি করিয়াই এই সংখ্যাগুলি অবধারিত হইল।

২। যুক্ত-নির্ব্বাচন-নীতি অনুসারে এই সকল সভায় নিম্নলিখিত ধারায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইবে—যে কোন সাধারণ নির্ব্বাচক-তালিকাভুক্ত অনুন্নতশ্রেণীর লোকেরা একটী "মণ্ডলী" গঠন করিয়া প্রত্যেকে একটী ভোট দ্বারা প্রতি সংরক্ষিত আসনের জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের চারিজন নির্ব্বাচনপ্রার্থীর একটী 'প্যানেল' নির্ব্বাচন করিবেন এবং এইরূপ প্রাথমিক নির্ব্বাচনে যে চারিজন সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাইবেন তাঁহারা সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার জন্য অধিকারপ্রার্থী হইবেন।

৩। কেন্দ্র-ব্যবস্থাপরিষদেও অনুরূপ যৌথ-নির্ব্বাচন-প্রথা দ্বারা অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাসমূহে তাহাদের প্রতিনিধি-প্রেরণ সম্বন্ধে ২ নং সর্ত্তে যে প্রাথমিক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

৪। কেন্দ্র-ব্যবস্থা-পরিষদে বৃটিশ ভারতের মোট আসনের শতকরা ১৮টী হারে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

৫। পূর্ব্বোক্ত 'প্যানেল'-প্রথায় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা দশ বৎসরেই রহিত হইবে—সম্ভব হইলে, তৎপূর্ব্বেও উহার অন্ত হইতে পারিবে।

৬। চুক্তিপত্রের ১ম ও ৪র্থ ধারায় আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা উভয় পক্ষের আপোষ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে।

৭। কেন্দ্র-প্রাদেশিক-ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ব্যাপারে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার লোথিয়ান কমিটীর নির্দ্দেশানুরূপ হইবে, স্থানীয় লোকালবোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ব্বাচন-ব্যাপারে বা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ব্যাপারে অনুন্নত শ্রেণী বলিয়া কাহারও কোনরূপ বাধা অনধিকার থাকিবে না। শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারেই তাহাদের সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত অধিকারদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

৮। প্রত্যেক প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুবিধার জন্য সরকারী তহবিল হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হইবে।

এই সংবাদ শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা অপরাহ্ন ২॥০ ঘটিকায় মহাত্মার গোচর করিলেন। মহাত্মার বদনমণ্ডলে সাফল্যের স্বর্ণরশ্মি ঝলসিয়া উঠিল। তিনি সংবাদবাহকের গণ্ডে স্নেহ-শীতল করাঙ্ক-চিহ্ন আঁকিয়া, আম্বেদকারের দিকে প্রেম ও আনন্দের অমৃত-দৃষ্টি ফিরাইলেন। সে কি মহামিলনের মধু-বর্ষণ, আম্বেদকার দুইদিন পূর্ব্বে যে অনশননীতি "political stunt" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ তাহাই উভয়ের হৃদয়-ভেদ দূর করিল—মহাত্মা তাই করুণ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—"এ পরিবর্ত্তন সত্যই সুন্দর, অতি সুন্দর!'

মহাত্মার অপার্থিব হৃদয়-টুকুর আস্বাদ যে পাইয়াছে সে ভুলিবে না। এ হৃদয়ের তুলনা নাই। তিনি—এই দিক্, হৃদয়গুণেই সর্ব্বজয়ী, ভারতের হৃদয়-সম্রাট্। বিলাতের যে সকল স্বার্থপর রাষ্ট্রবিদ্‌গণ তাঁর লোকমান্যত্ব-গুণে সন্দিহান, তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া বিলাতের হৃদয়বান্ মনীষিগণই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন:—"It may be said

that Gandhi is not the voice of India; he speaks for a fraction, which some put at a third, and others more nearly at twice that proportion. But there come electrical moments when one is compelled to realise that this strange man has the genius that can by a dramatic act rally India to himself and give to this voice the resonance of legions. With this voice, we must converse while there is in his body."

অর্থাৎ "যাঁহারা বলেন—গান্ধী ভারতের মুখপাত্র নহেন—তিনি মাত্র এক তৃতীয়াংশ বা বড় জোর দুই তৃতীয়াংশের প্রতিনিধি-স্থানীয়; এমন এক বিদ্যুন্মুহূর্ত্ত আসে যখন শুধু তাঁহাদের নহে, সকলকেই স্বীকার করিতে হয়—যে এই অসাধারণ মানুষটী স্বীয় প্রতিভার দাপটে একটী বিশিষ্ট আচরণেই সারা ভারতকে তাঁর দিকে টানিয়া আনিতে পারেন ও কোটী কোটী মানবের প্রাণের কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়। যতদিন ইহার দেহে প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, ততদিন ভারতের এই জাগ্রত বাণীমূর্ত্তির সহিতই আমাদের কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে।"

অখণ্ড হিন্দুভারতের কণ্ঠোত্থিত দাবী অনশনের ৭ম দিনেই সমুদ্র-বার্ত্তায় বিলাতের রাজদরবারে পৌছিল—প্রধান মন্ত্রী এ দাবী ক্ষিপ্রবেগে স্বীকার করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের [illegible]নুভবতার পরিচয় দিলেন—ভারতের গৌরবমণির প্রাণ-রক্ষায় ভারতবাসী আশ্বস্ত হইল।

অনশনের ৭ম দিবসে সঙ্কল্পের পূরণে, ব্রত উদ্যাপন করিয়া, [illegible]

তপস্বী অনশন-ভঙ্গ করিলেন। সেদিন তাঁহার শিয়রে ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ স্নেহাশীর্ব্বাদের অর্ঘ্য লইয়া শক্তি-স্তম্ভ-রূপে উপস্থিত। আশ্রমের সঙ্গিনী চির-তপস্বিনী শ্রীমতী গান্ধী, শ্রীমতী কমলা নেহেরু, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল, শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই ও একজন পঞ্চমা জাতীয় তাঁহার অনুগত ও ভক্ত কয়েদী প্রভৃতি শতাধিক আত্মীয়, বন্ধু, স্নেহের পরিজনে পরিবৃত হইয়া প্রার্থনান্তে মহাত্মা লেবুর রস পান করিলেন। কারাগার মহাতীর্থে পরিণত হইল। সে অনুপম স্বর্গীয় শোভা-দৃশ্যের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভারতের প্রাণ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বিশ্বেশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়িল। এই মহিমাময় চিত্রই প্রত্যক্ষদর্শী কবির চিত্রে আনুপূর্ব্বিক ফুটিয়াছে—"প্রাচীরের কাছে মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হ'ল। চতুর্দ্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বস্‌লেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector General of Prisons—যিনি গভর্ণমেণ্টের পত্র নিয়ে এসেছেন—অনুরোধ করলেন রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বল্লেন—"জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো"—এই গীতাঞ্জলীর গানটী মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মত সুর দিয়ে গাইতে হলো। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তারপর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরী বাঈয়ের হাত হ'তে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে, সবরমতী আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে "বৈষ্ণব জন কো" গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হলো—সকলে গ্রহণ করলেম। জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটে নি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হলো জেলখানায়, তার

সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলো। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্ত্তি—একে বলতে পারি—যজ্ঞসম্ভবা!”

ধন্য ভারত—জুদের মাথার মণি যেদিন ক্রুশবিদ্ধ হইল, সেদিন তাহারা তাহাতে উদাসীন ছিল, এই মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আজ ভারতের বিশকোটী হিন্দুর আর্ত্তনাদে জগৎ ধন্য হইল।

চিরযুগ জাতির অবনতি ও পাপের জন্য তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকে বলি দিতে হইয়াছে। এ আত্মবলির কাহিনীতে ইতিহাস চিরমুখর। সত্যের জন্য, জাতির জন্য, হিন্দু অসংখ্যবার আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। শিখজাতির অভ্যুত্থান-কল্পে শিখগুরুর আত্মদান এ দেশে নূতন নয়। হিন্দুজাতির কলঙ্কভার বহিয়া মহাত্মার আত্মাহুতির সঙ্কল্প নূতন করিয়া লওয়ার কিছু ছিল না।

বিগত সপ্তম শতাব্দীতেও সত্যের জন্যই আচার্য্য কুমারিল ভট্টকে আমরা তুষানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়াছি। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে, ছদ্মবেশে, কাপট্য আশ্রয় করিয়া হিন্দুগৌরবরক্ষায় বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন; বৌদ্ধদের ভিতরের সংবাদ লইয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কিন্তু সফলমনোরথ না হওয়ায়, হিন্দুর দিব্যাচার পালন করেন নাই, এই অনুতাপে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল। হিন্দুকে ষড়যন্ত্র করিতে নাই, হিন্দুর ধর্ম্ম কপটাচারে ব্যর্থ হয়, ক্ষুণ্ন হয়; হিন্দুর দর্প নাই, অভিমান নাই, ক্রোধ নাই, নিষ্ঠুরতা নাই, বক্রতা নাই; হিন্দু-ধর্ম্মের অভিমান বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রপরায়ণ করিয়াছিল; কারিকাকার কুমারিল সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। হইতে পারে, ইহা মূর্খতা, ইহা উন্মাদের কীর্ত্তি; কিন্তু উজ্জ্বল-স্বরূপ আত্মা যাহাতে মলিন হয়, তাহা আশ্রয় করা

পাপ বলিয়াই এ জাতি চিরযুগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কেহ অজ্ঞানজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভগবানে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া সম্পন্ন করেন, কেহ বা আত্মকৃত অপরাধের শাস্তি স্বয়ং বিধান করিয়া পাপক্ষালন করেন; পরন্তু এ জাতি ভাবের ঘরে চুরি করিয়া আত্মঘাতী হইতে চাহে নাই। তাই আজ রোমের প্রাধান্য, বৈশিষ্ট্য কালের কুলাল-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে; প্রাচীন ইউরোপের ধর্ম্ম কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, তাহা আর নিরূপণ করা যায় না, মিশর আত্ম-ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়াছে, প্রাচ্যের সকল জাতি, মূল হারাইয়া আকাশ-লতার মত পরধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—গোঁড়া হিন্দুই কোন অনাদি কাল হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহার মূলনির্ণয় হয় না। মহাত্মা সেই হিন্দু-জাতির যে চরিত্র, যে আচার, তাহা যে প্রাণপণে পালন করিতে চাহিলেন, তাহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি প্রভৃতি দৈবী-সম্পদে যে জাতি শক্তিশালী, আত্মজয়ী, তাহাকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরাজিত করিতে সমর্থ নয়। ভারত তাই সর্ব্বজয়ী হইয়া আজও বাঁচিয়া আছে, চিরযুগ থাকিবে—ভারত যে সনাতনের বিগ্রহ-মূর্ত্তি!

ভারতের সৌভাগ্য, আজ জাতির প্রধান পুরুষ অবজ্ঞাত নহেন, হিন্দুর এই আত্মসংবিৎ জাগিয়াছে বলিয়াই মহাত্মার প্রাণরক্ষা হইল—এ জাতি মৃত্যুঞ্জয়ী তাহা প্রমাণ করিল। ধন্য ভারতের অস্পৃশ্য জাতি, চরম পরীক্ষার ভিতর দিয়া হিন্দুত্বের জয় তোমাদের কণ্ঠেই আজ বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হইয়াছে। মহাত্মার জীবনে এ জাতি [illegible] হইয়া নবজন্ম লাভ করুক, গীতার "মামেতি" এই উত্তর রহস্য-মন্ত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠুক। মহাত্মার অনশন হিন্দু ভারতের বহু [illegible] বর্ষের

গ্লানি দূর করিয়া অখণ্ড জাতির ভিত্তি সুদৃঢ় করিল। আমরা আজ স্বস্তি-বচন্ উচ্চারণ করিয়া বলি—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ। হরি ওঁ।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

ক্রম	গ্রন্থ			মূল্য
১।	শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন		...	১৷০
২।	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ		(২য় সং)	১৷৷০
৩।	আত্মসমর্পণ যোগ	...	...	১৲
৪।	যৌগিক সাধন	...	(২য় সং)	৷৷৶০
৫।	লীলা	...	(২য় সং)	৷৶০
৬।	সাধনা	...	(২য় সং)	৷৷৶০
৭।	নারীমঙ্গল	...	...	৷৶০
৮।	ভারতীয় মন্দির	..	(গল্প-সংগ্রহ)	১৷০
৯।	স্বদেশীযুগের স্মৃতি	...	...	১৷৷০
১০।	ভারতীয় সঙ্ঘ-তত্ত্ব	...	...	৸০
১১।	ভারত-লক্ষ্মী	...	...	১৷০
১২।	অনশনে মহাত্মা	...	...	১৷০
১৩।	উদ্বোধন	...	(নাটক)	[illegible]
১৪।	পতিব্রতা	...	ঐ	১৲
১৫।	চণ্ডীদাস	...	ঐ	১৷৷০
১৬।	যুগ-গুরু	...	...	[illegible]

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।